জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে গদ্যনির্মাণ

[এম.ফিল. (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

অংশুমান খাঁন

শিক্ষাবর্ষ- ২০১৭-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা- ০০১৭০০১০৩০০২

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা- MPBE194002

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৩৩১৭৭ অফ্ ২০১৫-২০১৬

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বরেন্দু মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে গদ্যনির্মাণ

[এম.ফিল. (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

অংশুমান খাঁন

শিক্ষাবর্ষ- ২০১৭-২০১৯

ক্রমিক সংখ্যা- ০০১৭০০১০৩০০২

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা- MPBE194002

রেজিস্ট্রেশন নং- ১৩৩১৭৭ অফ্ ২০১৫-২০১৬

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বরেন্দু মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

This is to certify that the following papers continue original research on "জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে গদ্যনির্মাণ" by Anshuman Khan to be submitted in order to fulfill partial requirement of degree of M.Phil (Bengali). I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head	Supervisor
----------	----------
Dept. of Bengali	Dept. of Bengali
Jadavpur University	Jadavpur Universiy

প্রাক্‌কথন

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ। তিনি তাঁর স্বল্প জীবৎকালের মধ্যে কবিতা ছাড়াও উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্য ইত্যাদি নানা ধরনের লেখা দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর এই বিপুল পরিমাণ গদ্যরচনা সম্পর্কে আজও বাঙালি পাঠক খুব বেশি সচেতন নন। সম্প্রতি তাঁর গদ্য সাহিত্য নিয়ে চর্চা শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। একজন প্রতিষ্ঠিত কবি একের পর এক উপন্যাস রচনা করে যাচ্ছেন অথচ তা প্রকাশে তেমন উদ্যোগী হচ্ছেন না। এমন নয় যে, তিনি নিছক ইচ্ছেপূরণের জন্য গদ্য লিখছেন। তাহলে কেন এই আড়াল? উপন্যাস, ছোটগল্পগুলি প্রকাশে কেন এই অনীহা? এর একটি কারণ তাঁর অকালপ্রয়াণ বলে মনে হলেও তাতেই সব কৌতূহল মেটে না।

জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি পড়তে গিয়ে দেখি সেখানে বাংলাভাষার নানাবিধ বিষয় নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, যার মধ্যে বারবার তাঁর নিজস্বতা ফুটে উঠছে ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে যা বেশ আকর্ষণীয়। এই কৌতূহল আর আকর্ষণ থেকেই তাঁর উপন্যাসগুলিকে শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখার ইচ্ছে হয়। এই ইচ্ছেতে আরও রসদ যোগান অধ্যাপক বরেন্দু বাবু। উনি মনের অনেকগুলো জানালা খুলে দিয়ে একটি ডিসিপ্লিনের মধ্যে বিষয়টিকে ভাবতে শেখান। কোনও একটি প্রাথমিক ভাবনাকে কীভাবে নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তার থেকে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় তা ওঁর কাছ থেকেই শেখা। উনি ওনার অজস্র ব্যস্ততার মধ্য থেকে যেভাবে আমাদের জন্য সময় বের করেন তা অকল্পনীয়। আমার ভাষাবিজ্ঞানের হাতেখড়ি উদয় কুমার চক্রবর্তীর কাছে, যিনি না থাকলে আমার এই কাজ করা

সম্ভবই হত না। এছাড়া বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকারাও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিভাগীয় পাঠাগারের আইভিদি ও হরিশদা বছরের পর বছর বই সংক্রান্ত আমাদের নানা দাবি মিটিয়ে থাকেন। ওঁদের ছাড়া কোনও গবেষণায় সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে বন্ধু লোপামুদ্রা দত্তের কথা বলতে হয়, যে জীবনানন্দ সম্পর্কিত অনেকগুলি বই দিয়ে আমায় সাহায্য করেছে। ক্লাসের বন্ধুরাও নানা সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এঁদের সকলের কাছেই আমি ভীষণভাবে ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঋণ পরিশোধের তেমন কোনও সুযোগ নেই। গবেষণাকর্মের প্রতি আনুগত্যই হয়তো এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায়। আমি সেই কাজে কতদূর সফল হয়েছি তা জানিনা তবে শেখার সুযোগ পেয়েছি প্রচুর। যা সকলের ভাগ্যে জোটে না। এবং এই শেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক বরেন্দু বাবুর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের উদ্ধৃতাংশের মধ্যে লেখককৃত বানানকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও বাকি অংশে আকাদেমি বানান অভিধান-কেই অনুসরণ করা হয়েছে।

যাদবপুর
তারিখ-

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
প্রথম অধ্যায়: জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে বাচন সংগঠন	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজভাষার ব্যবহার: প্রসঙ্গ জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাস	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়: জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে অন্বয়ের সংগঠন	৬২
উপসংহার	৮৪
গ্রন্থপঞ্জি	৮৯
পত্র-পত্রিকা পঞ্জি	৯১

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)-এর *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) গ্রন্থ দিয়েই বাংলা আধুনিক উপন্যাসের পথ চলা শুরু বললে অত্যুক্তি হবে না। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থে বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাসের ব্রহ্মা অর্থাৎ স্রষ্টা নহেন, ত্বষ্টা অর্থাৎ শিল্পস্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় আধুনিক উপন্যাসের অর্থাৎ ইংরেজী নভেলের পত্তন করিয়াছিলেন।'[১] তিনি শুধু আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সার্থক রূপেরই জন্ম দেননি, বাংলা উপন্যাসকে এক সুউচ্চ জায়গাতেও নিয়ে যান। ফলে বয়সে কাব্য, নাটকের চেয়ে অনেক ছোট হলেও উপন্যাস অচিরেই তাদের সমান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের থেকেও অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিকের হাতে বাংলা উপন্যাসের আরো বিস্তৃতি ঘটে এবং উপন্যাস সাহিত্যের বাকি ধারাগুলির থেকেও কখনও কখনও অধিক গুরুত্ব পেতে থাকে। উপন্যাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে অনবরত। এই পরীক্ষা শুধু যে উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। উপন্যাসের গঠন তার ভাষা তার উপস্থাপন পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়েও চর্চা শুরু হয়। এই চর্চায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেন, তেমনি বাক্যের ক্রিয়া, তার গঠনরূপ, অন্বয় ইত্যাদি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁর একাধিক উপন্যাসে। অর্থাৎ উপন্যাসের নির্মাণ প্রক্রিয়াও লেখকদের চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। এরপর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আগমন ঘটে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮)। তাঁর আগমনে বাঙালি সমাজ জীবনের নানান সমস্যা স্থায়ী ভাবে স্থান পেতে থাকে উপন্যাস সাহিত্যে। কবিতা, নাটকের মতো উপন্যাসও সমাজ জীবনে প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এরপর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত

(১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। যাঁরা নতুন নতুন দিক যুক্ত করতে চেষ্টা করেন তাঁদের সাহিত্যে এবং বাংলা উপন্যাসকে এক সমৃদ্ধতর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। সময়কালের দিক থেকে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) এঁদের সমসাময়িক। কিন্তু কবি জীবনানন্দের সাথে আমাদের পরিচয় থাকলেও তাঁর গদ্য সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বছর আগেও আমাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। ফলে তাঁর বিশাল গদ্যরচনা থেকে এতদিন বাঙালি পাঠককুল প্রায় বঞ্চিতই ছিলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ, ভূমেন্দ্র গুহ, দেবেশ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উৎসাহী গবেষকের নিরলস পরিশ্রমের ফলে আমরা তাঁর লেখা বিপুল গদ্য সাহিত্যের কথা জানতে পারি। যার মধ্যে আছে এগারটি উপন্যাস (একমাত্র *'বিরাজ'*-কে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না, অলিখিত, মাত্র পাতা চারেক লেখা) শতাধিক ছোটগল্প, প্রবন্ধ, লিট্যারেরি নোটস ও একশোর বেশি চিঠিপত্র। কিন্তু এই তথ্যগুলিকেও আর সম্পূর্ণ বলা যায় না কেননা, সাম্প্রতিক কালের এক অন্যতম জীবনানন্দ গবেষক গৌতম মিত্র তাঁর *পাণ্ডুলিপি থেকে ডায়েরি* এই গ্রন্থে জীবনানন্দের রচনার হদিশ দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন, তিনি ১৯টি উপন্যাস, ১২৭টি ছোটগল্প, ৭৯টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ, প্রায় ৩০০০টি কবিতা, শ'দেড়েক চিঠি ও ৪০০২ পৃষ্ঠার ডায়েরি লিখে গেছেন। দুঃখের বিষয় এই বিপুল রচনার সামান্যই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় এবং তারও বেশির ভাগ অংশ কবিতা। ফলে তাঁর সমসাময়িক অনেক মানুষই তাঁকে শুধু কবি হিসেবেই চিনেছেন। যে কারণে জীবনানন্দ জীবদ্দশায় তাঁর কবি প্রতিভা সম্পর্কে আঁচ পেলেও তিনি গদ্য রচয়িতা বা ঔপন্যাসিক হিসেবে কেমন তা জেনে যেতে পারেননি। অবশ্য কবি হিসেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা যে খুব সহজে হয়েছিল তা নয়। অনেক বিরূপ সমালোচনারই মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। তবে পরবর্তীকালের পাঠক সমালোচকেরা বুঝেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি জীবনানন্দ। কিন্তু তাঁর এই কবি-খ্যাতির আড়ালে বারবার যিনি ঢাকা পড়ে গেছেন তিনি গদ্যকার জীবনানন্দ। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে জীবনানন্দ নিজেও তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্পকে লোকসমক্ষে আনেননি। অথচ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের ধারাকে যাঁরা যথার্থ অর্থেই অন্যদিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জীবনানন্দ দাশ ও কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। জীবনানন্দের লিট্যারেরি নোটস্ পড়লেই বোঝা যায় দেশ বিদেশের গল্প, উপন্যাস নিয়ে তিনি নিয়মিত খোঁজ রাখতেন; এমনকি সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিকদের রচনাও পড়তেন। যদিও তাঁদের লেখা সম্পর্কে তিনি যে খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা নয়, বরং খানিকটা নির্মোহ দৃষ্টিতেই তিনি দেখতেন এইসব রচনাকে। এবং তাঁর সমকালের বাংলা ঔপন্যাসিকরা যে বিশ্বমানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারছেন না তাও তিনি বুঝতেন। *The Novel in Bengal* প্রবন্ধে তিনি বলছেন শরৎচন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত জানিয়েছেন তা হল এরকম—

> The novelists who come after him [Saratchandra] present a rather impressive array. They all appear to have learned at the venerable knees of their important predecessors and of some modern European masters. There is hardly any lone explorer among them if we accept Manik Banerjee of even Virginia Woolf's or of Malraux's or Koestler's type. Sartre's counterpart too compactly illustrating in art what a thinker with modern appeal had propounded in his philosophy we have none among the living novelists of Bengal. Experience at various levels and remarkably real in their setting are done into stories sometimes with refreshing candour or naiveté or worse in many of Tarasankar Banerjee's fictions and at the other times with morbid irony or tonic acidity in Manik Banerjee's novel. Plots, more or less well-conceived instead or streams of

> consciousness still hold the sway in Bengali novels. But that does not ensure that all these novelists tell their stories always very clearly or that the constituents features of their books and the way they are unfolded work generally to a humanly intelligible end. There is a good deal of airing of blatant, even wild views, or not so much, and not always confined to the economic man or his political statecraft, but which embrace other spheres also—that hang very loosely in some novels serving the authors and their good or pretentious plots rather ineffectually.[২]
>
> [*বিভাব*, পৃ. ১৯০]

তিনি যে শুধু বিশ্ব বা সমসাময়িক গদ্য সাহিত্য পাঠ করেছেন বা তার সমালোচনা করেছেন তা-ই নয়, সমালোচনার সমান্তরালে তিনি সৃষ্টিও করেছেন একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি। যদিও তা প্রকাশে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের তাঁর অকাল মৃত্যুর কথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

জীবনানন্দ যে সমকালীন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে পারেননি তা আমরা আগেই বলেছি। এবং এর পাশাপাশি তিনি নিজেও উপন্যাস রচনা করেছেন। এর ফলে একটি প্রশ্ন মনে জাগে, তিনি যখন সমকালীন কথা সাহিত্যের ওপর বীতশ্রদ্ধ তখন তিনি তাঁর রচনায় কি অন্য কোনও ধারা বা রীতির প্রবর্তন করার চেষ্টা করছেন যা সমাকালীন সাহিত্য ধারা থেকে আলাদা? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি তাঁর বিপুল গদ্য সাহিত্যের দিকে নজর দিই তাহলে দেখব সেখানে অনেক বিষয়ে অভিনবত্ব আছে। প্রায় প্রথম উপন্যাস থেকেই তিনি মূলধারা থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। নিছক গল্প বলার জন্য তিনি কলম ধরেননি। যে কারণে তাঁর উপন্যাসে অনেক সময়ই বাইরের ঘটনা তেমন চোখে পড়ে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাইরের কোনও ঘটনার বর্ণনা সাধারণ ভাবে অনাবশ্যক মনে

হয়। বাইরের ঘটনা প্রবাহের মাঝে তার হয়তো বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় সেই আপাত অপ্রয়োজনীয় বর্ণনাই হয়তো সেই চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শৈলী বিজ্ঞানীদের কাছে জীবনানন্দের উপন্যাস আরেকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শব্দ নির্বাচন বা ভাষা প্রয়োগ। আমাদের এই কাজ শৈলী বিজ্ঞানকে সামনে রেখেই। আমরা কাজের সুবিধার্থে জীবনানন্দের প্রতিনিধি স্থানীয় পাঁচটি উপন্যাস বেছে নিয়েছি। বলা বাহুল্য এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভালোলাগা যেমন রয়েছে তেমনই তাঁর সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবন যাতে ধরা পড়ে তারও চেষ্টা রয়েছে। যদিও তাঁর সমগ্র ঔপন্যাসিক জীবনকে গবেষণায় আবদ্ধ করার জন্য মাত্র পাঁচটি উপন্যাস যথেষ্ট নয়। তবু গবেষণার সময়সীমা মাথায় রেখে আমাদের এই ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছে। আমাদের নির্বাচিত পাঁচটি উপন্যাস হল- *কারুবাসনা*, *প্রেতিনীর রূপকথা*, *জলপাইহাটি*, *সুতীর্থ* ও *মাল্যবান*। এর মধ্যে *কারুবাসনা* ও *প্রেতিনীর রূপকথা* প্রথম দিকের রচনা। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে লেখা হয় *জলপাইহাটি* উপন্যাসটি। ওই একই বছরই মে-জুন মাসের মধ্যে রচিত হয় *সুতীর্থ* ও *মাল্যবান* উপন্যাস। এর মধ্যে *জলপাইহাটি* উপন্যাসটির নামকরণ লেখকের করা নয়। ১৯৮১-'৮২ সালে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় প্রকাশের সময় তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ এই নাম দেন।

আপাতভাবে তাঁর অনেক রচনাতেই দেখা যায় গ্রাম ও শহর একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। গ্রাম জীবন আর শহর জীবনের মধ্যেকার এক দ্বন্দ্বও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়। গ্রাম-শহরের এই দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে তিনি ঢুকে যান মানব মনের অন্দরে। যেখানে দেখা যায় আসল দ্বন্দ্ব মানুষের ভেতরেই সংঘটিত হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার এই ক্লেদ উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রে। সেখানে শরীর এবং মনের জটিল সম্পর্কও দেখানো হচ্ছে। গ্রামের মানুষ আর শহরের মানুষের জীবনযাত্রা তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, সমস্যা পৃথক হলেও

তারা একে ওপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তারা একই মানব সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন অংশ। তাই একক ভাবে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে না। তাঁর উপন্যাসে আধুনিক সভ্যতার নিষ্ফলতার দিকটিও ফুটে উঠেছে বিশেষভাবে। সেখানে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি সম্পর্কও যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। এখানে আবার তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যও তৈরি হচ্ছে। এই পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই শৈলীর দিক দিয়ে।

আমরা এই গবেষণায় তাঁর নির্বাচিত উপন্যাসগুলিকে শৈলী বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করে দেখতে চেয়েছি। তাঁর উপন্যাসের কাহিনি উপস্থাপনরীতি, গদ্য নির্মাণ প্রক্রিয়া, বাচন সংগঠন, অন্বয় সংগঠন, ভাষা রেজিস্টার, উপন্যাসে ক্রিয়াপদের ব্যবহার ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে তাঁর উপন্যাসের বিশেষত্বগুলি খুঁজে বের করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের ভাষা নিয়ে যে দুর্বোধ্যতার কথা ওঠে, আশা করি তার কারণও বোঝা যাবে আমাদের এই গবেষণাকর্ম থেকে।

তথ্যসূচি

১) সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ১৭৪।

২) সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.)। *বিভাব* । কলকাতা: বিভাব, ১৯৯৮।

প্রথম অধ্যায়

জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে বাচন সংগঠন

বাচন (discourse) হল ভাষার অবিচ্ছিন্ন প্রসার যা বাক্যের চেয়েও বৃহৎ একক (unit) হিসেবে গণ্য হয়। ভাষার এই অবিছিন্ন প্রসারতাকে মানদণ্ড হিসেবে ধরলে একটি অনুচ্ছেদ বা একটি সম্পূর্ণ রচনা অর্থাৎ একটি ছোটগল্প বা একটি উপন্যাস বাচন হিসেবে গণ্য হতে পারে। ড. অভিজিৎ মজুমদার 'discourse' শব্দটির পরিভাষা হিসেবে 'অধিবাচন' বা 'সন্দর্ভ' শব্দের ব্যবহার করেছেন।[১] বাচন বা discourse দুই ধরনের হয়— ১. সংলাপকেন্দ্রিক বাচন (dialogue oriented discourse) ২. বর্ণনামূলক বাচন (descriptive discourse)। সংলাপকেন্দ্রিক বাচন হল সেই অংশ যা সংলাপ দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ যেখানে আমরা চরিত্রের মুখ থেকে কথা শুনতে পাই। অর্থাৎ লেখক যখন চরিত্রের আড়ালে থাকেন। বর্ণনামূলক বাচন হল তা যা লেখক কর্তৃক বর্ণিত। অর্থাৎ কাহিনির মধ্যে লেখক যেখানে কথকের ভূমিকা পালন করেন। সংলাপকেন্দ্রিক বাচন ও বর্ণনামূলক বাচনের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য আছে, যদিও তা বিশেষ বিশেষ লেখকের হাতে বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। তবুও এই দুয়ের মধ্যে কিছু সাধারণ পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, সংলাপকেন্দ্রিক বাচন দ্রুত গতি সম্পন্ন অপরপক্ষে বর্ণনামূলক বাচনের গতি ধীর। সংলাপকেন্দ্রিক বাচনের ক্ষেত্রে বাক্যের দৈর্ঘ্য হয় অপেক্ষাকৃত কম। রচনার মধ্যে বর্ণনামূলক সংলাপের পরিমাণ বেশি হলে রচনার লয় হয় ধীর। অপরপক্ষে রচনার মধ্যে সংলাপকেন্দ্রিক বাচনের পরিমাণ বেশি হলে রচনাটি গতিময় হয়।

১. সংলাপকেন্দ্রিক বাচন- সংলাপকেন্দ্রিক বাচন যে কোনো গদ্য রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান। রচনার সংলাপই রচনাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। নাটকের ক্ষেত্রে তো সংলাপকেই

তার প্রাণ বলা যেতে পারে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ। একটানা বর্ণনার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই শুধু নয়, চরিত্রের সাথে পাঠকের সংযোগস্থাপন ও চরিত্রকে সম্পূর্ণ ভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই লেখক সংলাপের অবতারণা করেন। কখনো বা কোনও ঘটনাকে সার্থক ভাবে বর্ণনা বা পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্যও উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার করা হয়। রচনার প্রকরণ বদলের সাথে সাথে সংলাপ প্রকাশের রীতির কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন, নাটকের ক্ষেত্রে সরাসরি সংলাপ ব্যবহারই প্রথা। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে সংলাপ ব্যবহারের এই রীতি নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে এই সংলাপ তিন ভাবে প্রকাশ করা যায়, (এক) সরাসরি অর্থাৎ প্রথাগত ভাবে চরিত্রের নামের পর পূর্ণচ্ছেদ (।) ব্যবহার করে বা বক্তব্যের আগে ড্যাশ (—) চিহ্ন বসিয়ে বা বক্তব্যকে উদ্ধৃতি চিহ্ন সহযোগে আলাদা আলাদা বাক্যে রেখে চরিত্রের মুখে সংলাপ বসানো। নাটকের ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার পদ্ধতিই সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়। (দুই) বর্ণনার প্রথমে বা শেষে সংলাপ উদ্ধৃত করা এবং (তিন) বর্ণনার মাঝে সংলাপ উদ্ধৃত করা অর্থাৎ সংলাপের প্রথম ও শেষ উভয় অংশেই বর্ণনা থাকবে। সংলাপ তার চরিত্র হিসেবে নানারকম হতে পারে, জীবনানন্দের উপন্যাসে আমরা দুই ধরনের সংলাপ দেখতে পাই—ক) স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপ খ) কৃত্রিম আড়ষ্ট সংলাপ। নিচে এই দুই ধরনের সংলাপ নিয়ে আলোচনা করা হল।

ক) স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপ- স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপ সৃষ্টির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তা অকৃত্রিম। অর্থাৎ সেখানে লেখক খুব বেশি পরিবর্তন সাধন করেননি। লেখকের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ সেখানে থাকে না। লেখক চরিত্রের মুখের কথাকে বাহুল্য বর্জিতভাবে সরাসরি উপস্থাপন করেছেন মাত্র। এই ধরনের বাচন গঠিত হয় তথ্য সরবরাহ ও সাধারণ কথা-বার্তার মাধ্যমে। এই বাচনে চমৎকার নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিও সম্ভব। জীবনানন্দ তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসে স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপ বেশি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সংলাপ কীরকম হবে

তা অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর। পরিবেশ ও পরিস্থিতির বদলে সংলাপের ভাষা বদলে যায়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল-

দৃষ্টান্ত ১

কল্যাণী—'খুব বেশি নেয় তো তা হলে?'

'কে বেশি নেয়, কল্যাণী?'

'এক গ্লাস দুধ দু-আনা নেয় বললে—'

'হ্যাঁ'

'বেশ টাটকা দুধ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, খুব'

'তুমি খেয়ে দেখেছ?'

'না খাইনি?'

'বিনয় ভট্টাচার্যের দোকানে শিগগির যাও নি বুঝি?'

'না'

'এক কাপ চা খেতেও যাও নি?'

'না, শিগগির গিয়েছি মনে পড়ে না।'

'সত্যি যাও নি? বারে, এত তো চায়ের ভক্ত ছিলে? কি, বাড়িতে তো চা পাও না, আমি তো ভাবতাম বিনয় ভট্টাচার্যের দোকান থেকে চা খেয়ে আস তুমি।'

'না, মাঝে-মাঝে একটা চুরুট কিনতে যাই'

'চুরুট?'

'হ্যাঁ'

'আর-কিছু না?'

মাথা নাড়লাম—'না'

'চুরুট তো তোমাকে খেতে দেখি না আমি'

'মাসের মধ্যে দু-একটা খাই'

'তাই বা কখন খাও?'

'খাই রাস্তায়—সন্ধ্যার সময়'

'বেশ লাগে?'

'মন্দ কী!'

'কিন্তু দুধ খেও'

'কে? আমি?'

'হ্যাঁ'

'কেন বল ত?'

কল্যাণী কোনো জবাব দিল না।[২]

[*কারুবাসনা*, পৃ. ২১৩-২১৪]

দৃষ্টান্ত ২

'পুলিস ইনস্‌পেক্টর হয়ে এই সব বই পড়েন সেজকাকা?'

একটু আশ্চর্য হয়ে মেজকাকার দিকে তাকালাম।

'ওপেন হাইম, এডগার ওয়ালেস এই সব। অবসর পেলেই দিন-রাত এই সব নিয়ে পড়ে থাকে।'

'ওঃ এইগুলো?'

'এইগুলো অত্যন্ত ম্লেচ্ছ বই।'

'সময় কাটে মন্দ না।'

'চণ্ডাল দিয়ে এই সব বই পোড়াতে হয়।'

'কেন?'

'মানুষকে অন্তঃসার শুন্য করে ছাড়ে,' ছড়ি ঘোরাতে-ঘোরাতে মেজকাকা, 'সবসময় একটা নিষ্ঠাহীন চঞ্চলতা। রমেশের হয়েছেও তাই। মানুষের জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আলোচনা করবার মত না-আছে রুচি, না আছে শক্তি—ভগবানকে নিয়ে রোজ দু'দণ্ড বসবার মত অবসর সে খুঁজে পায় না। একখানা ভাল বই হাতে দিলে হাঁপিয়ে ওঠে। পা ছড়িয়ে দিনরাত ক্রাইম নভেল আর সেক্স নভেল নিয়ে।'

'ক্রাইম নভেল অবশ্য আমি পড়তে পারি না।'

'শয়তান ছাড়া কেউ পারে না।'

'কিন্তু সেক্স নভেল পড়েছি ঢের।'

'আর পোড়ো না; তার চেয়ে বরং হকিং পড়ো'

'হকিং?'

'হ্যাঁ আর হ্যাচিংসনের। অবিশ্যি এ সব বই কোনোদিন পড়ব না আমি; পড়লে না হয় রাস্কিন পড়ব আর-একবার, কিংবা টলস্টয় অথবা—।

'মেজকাকাকে বললাম, 'নভেল কাড়ে সেজকাকা ইংরেজি লিখতে শিখেছে বেশ।'

'হুম, সাহেবদের সঙ্গে দুটো ইংরেজি বলতে পারে না।'

'পারে না?'

'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে এ উন্নতি হল কী করে? সামান্য পোস্ট থেকে একেবারে গ্রেড?'

'আমড়াগাছি! খোশামুদি! তা ছাড়া আবার কী? পায়ে তেল মেখে-মেখে। আহা পকেটে ওর সব সময়েই তেল। রমেশের জন্য তেল যোগাড় করতে ওর বি-ও-সি সাবাড় হয়ে গেল।'

হাসছিলাম।

মেজকাকা—অত আমড়াগাছি যদি আমাকে দিয়ে করাতেন ভগবান, তাহলে সাঁ করে কমিশনার হয়ে যেতাম। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে হত না আর।'[৩]

[*কারুবাসনা*, পৃ. ২২১-২২২]

দৃষ্টান্ত ৩

—'বসেই থাকবেন?'

—'কিছুক্ষণ তো—'

—'আমি তা হলে ঘুমিয়ে পড়ি?'

—'নির্বিঘ্নে।'

—'কোথায় নামব জানেন?'

—'কোথায়?'

—'সেই ট্রেন ধরব গিয়ে; আপনি?'

—'আমাকেও ট্রেন ধরতে হবে।'

—'কলকাতায় যাবেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমিও কলকাতায়ই চলেছি।'

—'বেশ তো; কোন আখড়ায়?'

—'এই স্ট্রিমারটা ধরবে কখন খুলনায়?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ ভোরবেলায়'

—'তা হলে সারারাত স্ট্রিমারেই ঘুমোতে পারা যাবে?'

—'আজ্ঞে।'

—'একটা অনুরোধ আপনার কাছে।'

—'বলুন।'

—'আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি—'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তা হলে আমাকে আর জাগাতে যাবেন না।'

—'একটা হাতপাখা থাকলে আমি বরং আপনাকে হাওয়া করেই রাত কাটিয়ে দিতাম, গোঁসাই!'[৪]

[*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮]

দৃষ্টান্ত ৪

'খান?' জিজ্ঞেস করল নমিতা।

কোনো কথা না-বলে হাত বাড়িয়ে টিনটা কুড়িয়ে নিল নিশীথ।

'মাড়োয়ারিরা কী করেছিল?'

নিশীথ সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'না, কিছু করেনি'।

'পি-সি কী বলেছিলেন ওদের কথা?'

'সে সব কথা ছকে গেছে; ও অনেক আগের কথা।'

'কিন্তু কী বলছিলেন?'

'জিতেন কী কোনোদিন বলে নি কিছু এ সম্বন্ধে আপনাকে?'

'না'। নিঃশব্দ নিটোল কারসাজিতে ফিকে নীল অজস্র ধোঁয়া নাক মুখ দিয়ে বের করতে-করতে মিসেস দাশগুপ্ত বললে।[৫]

[*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৪]

দৃষ্টান্ত ৫

'কোথায় যাবে, ভবতোষ—'

'কফি হাউসে চলো—'

'কোনটায়?'

'বড়টায়—চৌরঙ্গী প্লেসে—'

'না, অত দূর যেতে পারব না। মাফ করতে হবে। কাছেই একটা চা-কফির দোকানে—'

'সে হয় না, —ওরা সব আসবে কফি হাউসে, আমার আর তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সব। স্কার্ফ, শাল, কাশ্মীরী, মির্জাপুরী-সিগারেট খায় কেউ কেউ-ক্যামেল সিগারেট-আমরা গিয়ে বসলেই হল—'

সুতীর্থ তামাশা বোধ করছিল। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আচ্ছা, চলো।'[৬]

[*সুতীর্থ*, পৃ. ৬২৩]

দৃষ্টান্ত ৬

দু-তিন দিন পরে মাল্যবান বললে, 'তোমার মেজদারা তো থাকবে অনেকদিন।'

'হ্যাঁ।'

'বছর খানেক?'

'না, মাস ছয়েক।'

‘একটা কথা আমার মনে হয়’, মাল্যবান বললে, ‘এ-বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন বাড়ি দেখলে মন্দ হয় না। দোতলা কিংবা তেতলায় বড়-বড় কয়েকখানা ঘর থাকবে।’

শুনে উৎপলা নাকে-চোখে খুব খুশি হয়ে বললে, ‘তা হলে তো খুব ভাল হয়।’ গুনগুন করে গাইতে-গাইতে বললে, ‘তুমি সে-রকম বাড়ি দেখেছ কোথাও?’

‘না।’

‘পাওয়া বড্ড শক্ত।’

‘আমি খুঁজছি।’

‘পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার মধ্যে পেতে হবে তো?’

‘ধরো গোটাদশেক বেশিই না হয় দিলাম।’[৭]

[*মাল্যবান*, পৃ. ৭৮৮]

প্রথম দৃষ্টান্তটি *কারুবাসনা* উপন্যাস থেকে গৃহীত। এখানে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর রোজকার কথাবার্তার ছবি। এখানে বাক্য হ্রস্ব ও গতিময়। সংলাপে যেমন নাটকীয়তা রয়েছে তেমনই রয়েছে বাস্তবতাও। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিও *কারুবাসনা* উপন্যাসেরই। এখানে সংলাপ কিছুটা উচ্চমার্গের হলেও তা অস্বাভাবিক নয়। কেননা শিক্ষিত উচ্চ রুচি সম্পন্ন বক্তার মুখে এই কথা বেমানান নয়। এবং তা সুন্দর ভাবেই লেখক রচনা করেছেন। আলোচনার মধ্যভাগে পুলিশ ইনসপেক্টর ‘সেজকাকা’ থাকলেও, সংলাপ অংশটিতে ‘মেজকাকা’র রুচি তার শিক্ষা, স্বভাব ইত্যাদিই ফুটে উঠেছে। তাই ‘মেজকাকা’র মুখে এই সংলাপ একদম যথাযথ। তৃতীয় দৃষ্টান্তটি *প্রেতিনীর রূপকথা* উপন্যাস থেকে গৃহীত। এখানে দেখা যাচ্ছে উপন্যাসের কথকের সাথে এক সহযাত্রী অচেনা বৃদ্ধের সংলাপ। যা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথাবার্তার অনুরূপ। চতুর্থ দৃষ্টান্তটি *জলপাইহাটি* উপন্যাস থেকে গৃহীত। দৃষ্টান্ত অংশটি দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু তথ্যের আদান-প্রদান। এবং সেই কারণে সৃষ্ট সংলাপ। ফলে বক্তাদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও তা কথা-বার্তায় বাধার কারণ হয়নি। পঞ্চম দৃষ্টান্তটি *সুতীর্থ* উপন্যাস থেকে গৃহীত। এখানে দুজন পরিচিত যুবক, যাদের অনেকদিন পর দেখা হয়েছে তারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রেস্তোরাঁ যাওয়ার জন্য কথা বলছে। উদ্দেশ্যটি ইঙ্গিতে প্রকাশ করার

কারণে সংলাপের মধ্যে খানিক রহস্যের সৃষ্টি হলেও তা অবাস্তবব হয়ে ওঠেনি। বা রহস্যটি বুঝতে পাঠককে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়নি। ষষ্ঠ দৃষ্টান্তটি *মাল্যবান* উপন্যাস থেকে গৃহীত। দৃষ্টান্তটিতে মধ্যবিত্ত স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন কথাবার্তা রয়েছে। যাদের সম্পর্ক মসৃণ নয়, কিন্তু ফলে সংলাপ অংশটি আরও নির্মেদ। দেখা যাচ্ছে, সকল দৃষ্টান্তেই সংলাপ ঝরঝরে ও বাহুল্যবর্জিত। লেখকের বাকচাতুর্যের ব্যবহার এখানে নেই। সংলাপগুলি সরল ও স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তোলাই এখানে লেখকের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সাথে এই সংলাপের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ উভয় বাক্য সংযোগেই স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপ তৈরি হয়। *কারুবাসনা* উপন্যাসের অনেকখানি জুড়েই রয়েছে স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপ। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে এই স্বাভাবিক বাস্তবোচিত সংলাপের পরিমাণ তুলনামূলক কম। সেখানে তিনি কৃত্রিম আড়ষ্ট সংলাপের ব্যবহারে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন।

একটি শব্দ দিয়েও যে একটি বাক্য তৈরি হতে পারে তা এখানে দেখা যায়। কেননা S-Structure বা বাক্যের অধিগঠনে একটি শব্দ থাকলেও D-Structure বা অধোগঠনে সম্পূর্ণ বাক্যটি থাকে। যেমন, প্রথম দৃষ্টান্তে স্ত্রী কল্যাণী যখন গল্পের কথককে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'বিনয় ভট্টাচার্যের দোকানে শিগগির যাও নি বুঝি?' তার উত্তরে কথক বললেন, 'না'। এখানে বাক্যের অধিগঠনে শুধু 'না' পদটি ব্যবহৃত হলেও আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, 'আমি বিনয় ভট্টাচার্যের দোকান শিগগির যাইনি'। অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তীর[৮] দেখানো পদ্ধতিতে আমরা বৃক্ষরেখার সাহায্যে এখানে বাক্যটির অধোগঠনটি তুলে ধরছি—

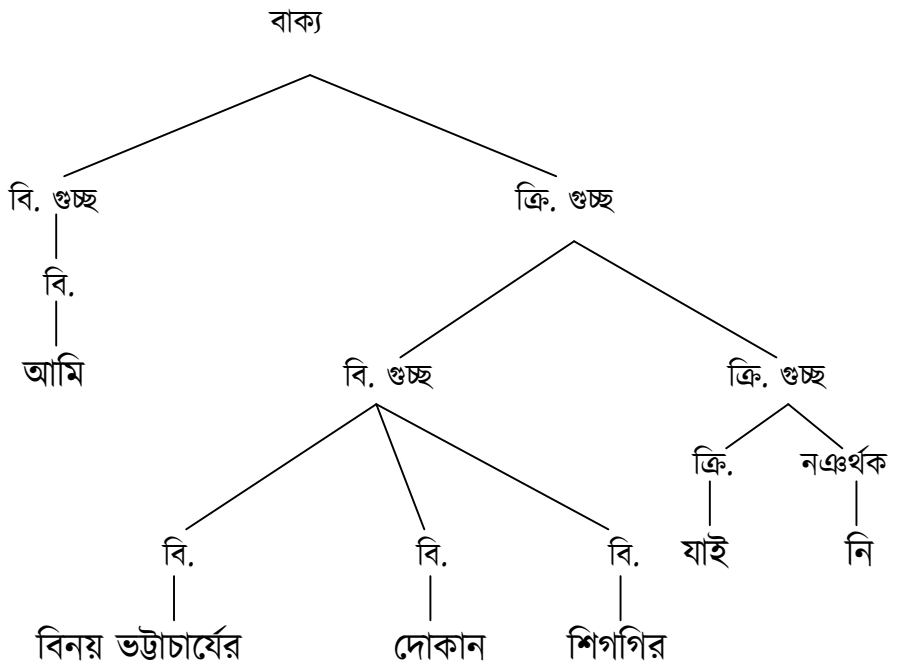

খ) কৃত্রিম আড়ষ্ট সংলাপ- জীবনানন্দের উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের সংলাপের ব্যবহার রয়েছে। এই ধরনের সংলাপ আকারে দীর্ঘ হয় এবং এই সংলাপের গতি মন্থর। যা রচনাকে ধীর করে তোলে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংলাপ অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা নয়। উপন্যাসকে এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছতে সাহায্য করে এই ধরনের সংলাপই। এই ধরনের সংলাপে পাঠকের অজান্তেই লেখক আর বক্তা দুজনে এক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। ফলে এই ধরনের সংলাপ প্রায়শই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনানন্দের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই এই কৃত্রিম সংলাপ। যা বানিয়ে তোলা অর্থাৎ যা চরিত্রের ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উঠে আসানি। যা আসলে লেখকের নিজের বক্তব্য। তাই লেখক সত্তা আর উপন্যাসের চরিত্র এখানে একাত্ম হয়ে ওঠে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল এই ধরনের সংলাপের—

দৃষ্টান্ত ১

> আমাদের রক্তমাংসের সার্থকতা খাবার সময়, দাঁড়াবার সময়, হাঁটবার চলবার সময়। আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সার্থকতা মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার কিংবা সন্ধ্যা ও ভোরের আকাশ প্রান্তরের নিরবয়ব,

অবাস্তবতার দিকে তাকিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের রক্ত-মাংস বুদ্ধি-কল্পনা আত্মা-প্রেম কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। সব জায়গাতেই কি এই রকম?[৯]

[*কারুবাসনা,* পৃ. ২১৬]

দৃষ্টান্ত ২

অনেক দিন পর্যন্ত ওয়েটিং রুমের পাশে সেই কাঠমল্লিকার গাছটা ছিল, প্রত্যেকবারই কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যেতাম আমি; কলকাতায় যেতে যেতে ফুলগুলো শুকিয়ে যেত; কিন্তু তবু দু তিন দিন পরেও সেই শুকনো ফুলের অতর্কিত গন্ধে হঠাৎ এক-একবার সেই ষোল বছরের আগের পৃথিবীর আবছায়া রূপ ভেসে আসত গ্রামের এক প্রান্তে শুষ্কপ্রায় পদ্মদিঘির জলে মৃত মায়ের মুখের মত।[১০]

[*প্রেতিনীর রূপকথা,* পৃ. ৩৯৯]

দৃষ্টান্ত ৩

'জলপাইহাটি' উপন্যাসে নিশীথ ও নমিতার কথোপকথনে বা হারীত ও অর্চনার কথোপকথনে প্রায়ই কৃত্রিম সংলাপ এসেছে যা আড়ষ্ট না হলেও অনেক সময়ই ভাবগম্ভীর কখনো বা দুর্বোধ্যও। এখানে সুচরিতার সাথে কথা বলার সময় হারীতের বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরা হল-

আমার মনে হয় তিনি যা করবেন, চোখ বুজে অনুসরণ করতে হবে তাই। খুব ভুল করবেন না তিনি। দেশের এখন যে-রকম টলমল অবস্থা, ধস্তাধস্তির সময় নেই; জওহরলালের মতণ নেতাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—না-পারলে সাবড়ে দিতে গেলে যে কোটালের বান ডাক দেবে তাতে এত দিকচিহ্ন উড়ে যাবে, এত বেশি অন্ধকার এসে পড়বে যে আমাদের পিতারা—আমরা শেষ হয়ে যাব সব, আমাদের সন্তানদের মাথা তুলে দাঁড়াতে কত বছর লাগবে কে জানে।[১১]

[*জলপাইহাটি,* পৃ. ৪৮২]

দৃষ্টান্ত ৪

মাঝে মাঝে আলোর উৎসের কাছে যেতে হয়। আমাদের নিজেদের বিচার হয়তো অন্য রকম, কাজ আলাদা প্রকৃতি আলাদা। কিন্তু তবুও যে সব মানুষ এরকম অশান্ত পৃথিবীতে এতদূর শান্তি, সত্য পেয়েছে তাদের কাছে গেলে ভালো হয়। হয়তো কিছু পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায় না। কিন্তু গান্ধী নিজে উপকার পেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর পথে চলে অনেকে; —বুঝতে পেরে আশা আসে মনে। সেটা লাভ। চারিদিককার পৃথিবী তো বলছে আশা নেই। সেটা ক্ষতি।[১২]

[*সুতীর্থ,* পৃ. ৭২৫-৭২৬]

প্রথম দুটি দৃষ্টান্ত উত্তম পুরুষে বর্ণিত। উত্তম পুরুষে বর্ণিত কাহিনির ক্ষেত্রে কৃত্রিম সংলাপ ব্যবহারেরে সুযোগ ও প্রবণতা বেশি থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি রচনায় কৃত্রিম আড়ষ্ট সংলাপের ব্যবহার একটু বেশি দেখা গেছে। কখনো তা কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কখনো বা কথক আপন মনেই বলে গিয়েছেন। পরের দুটি দৃষ্টান্তে লেখক সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ফলে এই ধরনের সংলাপ ব্যবহারের সুযোগ কমে গিয়েছে। এর কারণ হয়তো লেখক নিজের বক্তব্য চরিত্রের মুখে বসানো পছন্দ করতেন না। যে কারণে এই ধরনের সংলাপ সেখানেই বেশি দেখা গিয়েছে যেখানে লেখক সর্বজ্ঞ কথকের ভূমিকায় না থেকে কোনো এক বিশেষ চরিত্রের হাতে গল্প বলার ভার তুলে দিয়েছেন। এই কারণেই তাঁর উপন্যাসে কৃত্রিম সংলাপের পরিমাণ তুলনামূলক কম এবং তা বেশির ভাগ সময়েই আড়ষ্ট হয়ে ওঠেনি। লেখক শৈল্পিক ও নান্দনিক কারণেই এই ধরনের সংলাপ ব্যবহার করেছেন যা রচনার সাধারণ সংলাপের মধ্যে মিশে থেকে রচনাকে একটি অন্য মাত্রা (dimension) প্রদান করেছে।

২. বর্ণনামূলক বাচন- উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির সংরূপই (genres) হল বর্ণনামূলক। ফলে বর্ণনা প্রায়শই সংলাপকে ছাপিয়ে যায়। সংলাপ সৃষ্টির জন্যেও লেখককে ভিত্তি হিসেবে বর্ণনাকেই অবলম্বন করতে হয়। লেখকের ভাষার ওপর কর্তৃত্ব কতটা তা তাঁর রচনার বর্ণনা অংশ দেখলেই বোঝা যায়। বর্ণনা অংশ যে নিছক সংলাপের প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে সাহায্য করে তা নয়, বর্ণনার নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। বর্ণনা অংশই লেখকের শক্তি প্রমাণ করার জায়গা। বর্ণনা অংশের সাহায্যেই লেখক পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছতে পারেন। এবং লেখাকে কালজয়ী করে তুলতে পারেন। জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাস জীবনের যত পরিণতিতে পৌঁছেছেন ততই এই বর্ণনামূলক বাচনের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিশেষ্যবাচক রীতির (nominal style) ব্যবহার। প্রসঙ্গ অনুযায়ী জীবনানন্দের উপন্যাসে

ব্যবহৃত বর্ণনামূলক বাচনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে— ক)ঘটনাধারা খ) প্রকৃতি গ) চরিত্র ঘ) কাব্যিক বর্ণনা।

ক) ঘটনাধারা- যে কোনো ঔপন্যাসিককেই তাঁর উপন্যাসের ঘটনাক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্ণনার সাহায্য নিতে হয়। জীবনানন্দের উপন্যাসে বাইরের ঘটনাধারা তুলনামূলক ভাবে কম। তিনি তাঁর উপন্যাসের ঘটনাক্রমের বর্ণনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরল বাক্যের ব্যবহার করেছেন। বাক্যগুলি দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কখনো হ্রস্ব কখনো দীর্ঘ। যেখানে দীর্ঘ বাক্যের অবতারণা করেছেন সেখানে আসলে যূথবদ্ধবাক্য ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সেই দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে রয়েছে স্বয়ং সম্পূর্ণ একাধিক সরল বাক্য। কখনো তাদের ড্যাশ চিহ্ন (—) কখনো সেমি কোলন (;) বা কমা চিহ্ন (,)-এর মাধ্যমে একত্রিত করা হয়েছে, কখনো বা বাক্য বিগর্ভণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল—

দৃষ্টান্ত **১**

> দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ; কল্যাণী সেলাই করছিল, আমি বই ঝাড়ছিলাম, মুছছিলাম, পাতা উল্টাচ্ছিলাম—কিন্তু দু আনা পয়সার সম্বল আজ আমার কাছে নেই। এবং আমার বয়স চৌত্রিশ, বার বছর আগে এম-এ পাশ করেছিলাম বটে, বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি—আরো অনেক কাজ করেছি; কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনের পদ্ধতির সাথে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি। কাজেই এম-এ ডিগ্রী ও স্ত্রী-সন্তান সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না আক্ষেপের কথা হয় ত। কিংবা আক্ষেপের কথাই-বা কেন আর? জীবন তো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়েই নয়।[১৩]
>
> [*কারুবাসনা*, পৃ. ২১৩]

দৃষ্টান্তটিতে মোট পাঁচটি বাক্য আছে। কিন্তু বাক্যের অন্বয়টি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এখানে বাক্যের সংখ্যা প্রায় চোদ্দো পনেরোটি। যার অধিকাংশই হ্রস্ব ও সরল বাক্য। প্রথম বাক্যটির মধ্যেই রয়েছে আরো পাঁচটি বাক্য, যা বিগর্ভণ পদ্ধতিতে প্রধান বাক্যের সাথে জুড়ে

দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যটিকে ভাঙলেই আমরা ছ'টি পূর্ণ বাক্য পেতে পারি। প্রথম বাক্যের মধ্যে নিহিত বাক্যগুলি হল—

ক. দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকলাম।

খ. কল্যাণী সেলাই করছিল।

গ. আমি বই ঝাড়ছিলাম।

ঘ. বই মুছছিলাম।

ঙ. বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলাম।

চ. দু আনা পয়সার সম্বল আজ আমার কাছে নেই।

দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যেও রয়েছে পাঁচটি বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যে নিহিত বাক্যগুলি হল—

ক. আমার বয়স চৌত্রিশ।

খ. বার বছর আগে এম-এ পাশ করেছিলাম।

গ. বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি।

ঘ. আরো অনেক করেছি।

ঙ. সংসার ও সমাজে মানুষদের জীবনের পদ্ধতির সাথে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ [ভিন্নতা] ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি।

তৃতীয় বাক্যটি একটি দীর্ঘ বাক্য হলেও তা অনেকগুলি সম্পূর্ণ বাক্যের একত্রীকরণ নয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যটি দৈর্ঘ্যেও ছোট এবং সেখানে বিগর্ভিত বাক্যও নেই।

দৃষ্টান্ত ২

> স্টেশনের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত এই বাড়ির নারীদুটির কথাই ঘুরে-ফিরে মনে পড়ে আমার তাদের জন্য বেদনাও বোধ করি আমি—এমন গভীর বেদনা! একটা জীর্ণ শীর্ণ দাঁড়কাক অমাবস্যার অন্ধ স্রোতের মধ্যে তার অনেক দূরের নিঃসহায় শিশুদের জন্য যেমন অনুভব করে আমিও কি তেমন অনুভব করি না মা-তোমার জন্য; তোমার জন্য মালতী?[১৪]
>
> [*প্রেতিনীর রূপকথা,* পৃ. ৩৮১]

এই দৃষ্টান্তটিতে দুটি বাক্য রয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এই দুটি বাক্য আসলে আরো কয়েকটি বাক্যের সহযোগে গঠিত। এখানেও লেখক ড্যাশের সাহায্য নিয়েছেন জটিল বাক্য গঠনের জন্য।

দৃষ্টান্ত ৩

> উঠে দাঁড়াল জিতেন। সোয়া পাঁচটা। বাথরুমে চলে গেল। পৌনে ছ'টার সময় ফিরে এল। ছ-টার ভেতর স্যুট-টাই এঁটে ফিট হয়ে গেছে সে। নমিতা উঠেনি এখনও; স্ত্রীর স্লাকসটাকে টেনে দিল কোমর অবধি। হ্যাঁ, ঐ রকম থাক। আশেপাশের বাড়িতে সাধু বাবাজীরাই থাকে। দাশগুপ্তের কামরার জানালা সব খোলা বটে, তবে, নমিতা যেখানে শুয়ে আছে চারিদিক-কার কোনো বাড়িরই কোনো দৃষ্টিকোণই এখানে ঠিক মতন কান্নিক মারতে পারে না।[১৫]
>
> [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২১]

এখানে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ বাক্যই সরল বাক্য এবং হ্রস্ব। যে গুলি আকারে দীর্ঘ সেগুলির মধ্যেও রয়েছে অনেকগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্যের সমন্বয়। এবং বাক্যগুলি কার্য-কারণ সূত্রে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

দৃষ্টান্ত ৪

> দু-তিন দিন পরে সন্ধ্যের সময় বেশ শীত পড়েছে; একটা ছেঁড়া পুরোনো ওভারকোট গায়ে দিয়ে সুতীর্থ ব্যাগ হাতে করে চলছিল। লোকে দেখলে মনে করতে পারে খুব ব্যস্ত ডাক্তার হয়তো চলেছে জরুরি কোনো কেসে; গলায় একটা স্টেথোস্কোপ জড়িয়ে নিলেই হত। চেহারাটা ভারিক্কের চেয়েও বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল। ওভারকোট কাঁধে ফেলে অফিস থেকে বেরিয়েছে তিনটের সময়। বিকেলেই কোট গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কী সে চায়? ব্যাগের ভিতর কী আছে তার?[১৬]
>
> [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬২২]

এই দৃষ্টান্তটিতেও রয়েছে সরল ও হ্রস্ব বাক্যের আধিক্য। এখানে লেখক সংসক্তির দ্বারা বাক্যগুলিকে আবদ্ধ করেছেন।

খ) প্রকৃতি- জীবনানন্দের উপন্যাসে প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে রয়েছে উপমার ব্যবহার। এবং রয়েছে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রাচুর্য। এখানে লেখক ক্রিয়ার পরিবর্তে কেন্দ্রবিন্দুতে (focus) রাখতে চেয়েছেন বিশেষ্যকে, ফলে বিশেষ্যবাচক রীতির ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে hypotaxis রীতির ব্যবহার না করে parataxis রীতির ব্যবহার করেছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল—

দৃষ্টান্ত ১

> মাইলের পর মাইল এই নীলাভ মেঘের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ভারতবর্ষের পর্বতগুলোর কথা মনে হয় না আমার। আজকের জীবনের কথাও, পৃথিবীর জীবনের কথাও পিছে সরে যায়—মনে হয় এগুলো যেন গ্রিক রোম্যান ভূ-মধ্য-সাগরের ওপারের জিনিস, মৃত স্মৃতি ও ছবির দেশ-নীল নরম বাল্টিকের ওপারে একদিন যা রয়ে গেছে-কিংবা ম্যুরিলোর[?] দেশ, ভিঞ্চির মনের ভিতর, র‍্যাফেলের মনে—।[১৭]
>
> [*প্রেতিনীর রূপকথা,* পৃ. ৩৮২]

দৃষ্টান্ত ২

> বাইরে পড়ন্ত রোদ, সমস্ত ড্রয়িংরুম চৈত্রের বিকেলের বাতাসে ভরে গিয়েছে, দু-একটা খোলা পাতলা বইয়ের পাতা ফরফর করে উড়ছে। মস্ত বড় দেওয়াল-ক্যালেন্ডার দুটো উল্টে-পাল্টে শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ছলাৎ-ছলাৎ করে দেওয়ালের উপর। বাইরে পটকা ফলের মত আলোর রঙ যেন—গাছ, পাখি, আকাশ ছুঁয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে; যেন কেউ ছিল না এখানে। তাকে তারা সুজাতার মূর্তি দিয়েছে, অন্যমনস্ক হয়েছিল পুরুষ, তাকে তারা বিপ্রতিভ করে তুলেছে; কনে-দেখা আলোর কণিকারাশিকে জ্বালিয়ে তুলে বিচলিত করে দিয়ে পুরুষটিকে, নিমেষনিহত করে রেখে নারীকে হু হু করে ছুটে আসছে চৈত্রের অবলায়িত বাতাস; ডানার পালক ছিঁড়ে সাদা পায়রার, উড়ন্ত কাকটাকে ধাক্কা দিয়ে কার্ণিশে কাত করে, শিমূলের তুলো উড়িয়ে কোথায় ছুটে চলে গেল তারা সব কমলা রঙের ঐ মেঘ-সুমাত্রা, শ্যাম, মালয়ের মত ছেঁড়াফোঁড়া মেঘের আঁশ নিভিয়ে-নিভিয়ে ফেলে।[১৮]
>
> [*জলপাইহাটি,* পৃ. ৪৩৭]

দৃষ্টান্ত ৩

> তন্দ্রায় ঢুলে ঢুলে পড়ছিল সুতীর্থ। যেমন আমরা বলি, মাস্টার মশাই খুব বিশ্বাসী মানুষ—চাকরটা খুব বিশ্বাসী। যেমন বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী; রামচরণ খুব ধর্মভীরু; কোথায় গেছে সে সব? অনেক ওপরের হাওয়ার থেকে কে যেন বলছে এইসব তন্দ্রায় ঢুলে মনে হল সুতীর্থের। মস্ত বড় রাত্রির ময়দানে—নিশুথির তারাটা স্বাতী সপ্তর্ষি অভিজিৎ লুব্ধক বিশাখা—কী স্থিত দাঢ্য নিবিড় অনন্ত আকাশ সন্ধির অবিরল হাওয়া—অনেক স্বর্গীয় পাখি উড়ছে ঢের ওপরে—তার মধ্যে সবচেয়ে অনির্বচন পাখিটিই মানুষী। কি অসংস্থিত পৃথিবীর নিচের কয়লার গুঁড়ি উড়িয়ে ঘুরছে। কিন্তু সুতীর্থ যেখানে বসেছে সেখানে বাতাস ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু বরফের মত সাদা, বেলফুলের মত ঝরঝরে পাখিদের পালক, জুঁইয়ের মতন গন্ধ স্নিগ্ধতা, অথচ কোনো রক্ত নেই এমনই আশ্চর্য পরমাত্মার এক মেয়েমানুষের নিবিড়তর বাতাসের ভেতর বাতাসের মত যেন মিশে গেছে সুতীর্থ—কোন শরীর নেই সেই নির্ঝরের ভেতর—কোন সময় নেই সেই অপরিমেয় আলোয়—অনালোকিত অনন্ত বাতাসের ভেতর।[১৯]
>
> [*সুতীর্থ,* পৃ. ৭৩৭]

জীবনানন্দ সব সময়ই প্রকৃতির সাথে মানুষকে একাত্ম করে দেখেছেন। যে কারণে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি প্রায়ই প্রকৃতি থেকে উপমা তুলে এনেছেন। কখনো বা প্রাণীজগৎ থেকে সংগ্রহ করেছেন এই উপাদান। দৃষ্টান্ত ২ ও দৃষ্টান্ত ৩-এ আমরা প্রকৃতির সাথে মানুষের একাত্মতাই দেখতে পাই। যে কারণে বারবার তাঁর লেখায় উঠে আসে 'রোদ এড়িয়ে কিছুটা ছায়ার কিনারা বেছে বসেছিল মণিকা। কিন্তু তবুও রোদের অনেকগুলো চুমকি শাড়িতে গালে চুলে ছড়িয়ে ছিল। যার অর্ধেক নারী সেই মূর্তির নারীর দিকটার মত দেখাচ্ছিল মণিকাকে—বাকি সব বিশ্বম্ভর প্রকৃতির; রৌদ্রের বাতাসের নীল শাড়ির নীলাম্বর যেন।' এরকম লাইন।

গ) চরিত্র- বর্ণনামূলক বাচন চরিত্রের বর্ণনায় কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা সুন্দর ভাবে বোঝার জন্য আমরা 'চরিত্র'-কে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি—

(অ) চরিত্রের বাহ্য বর্ণনা- সরাসরি চেহারার বর্ণনা তাঁর উপন্যাসে তুলনামূলক কম, কখনো দু একটি শব্দে কখনো বা দু-তিনটি বাক্যে তিনি চরিত্রের বর্ণনা করে বেরিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর

চরিত্রগুলিকে অঙ্কন করেছেন তাদের বাহ্য বর্ণনায় নয়, তাদের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের বর্ণনায়। অর্থাৎ বিশেষ কোনো পরিস্থিতে তাদের চেহারা কেমন হয়ে ওঠে তা প্রকাশ করাতে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। যে কারণে জীবনানন্দের উপন্যাসে শুরুতেই আমরা কোনো চরিত্রের মুখ কল্পনা করে নিতে পারি না। গল্পের পরিণতির সাথে সাথে কখন যে এক একটি আমাদের ভেতর অঙ্কিত হয়ে যায় তা আমরা বুঝতেই পারি না। তিনি তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসেই চরিত্রগুলির চারিত্রিক দিক প্রকাশে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু যদি কোনো চরিত্র চেহারার দিক থেকে সাধারণ না হয় অর্থাৎ কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তখন লেখক গুরুত্বের সাথে তা বর্ণনা করেছেন। নারী চরিত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক দেহ সৌন্দর্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন চরিত্রগুলির বাহ্য বর্ণনা হোক বা তাদের স্বভাবের বর্ণনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা অন্য চরিত্রের দৃষ্টিতে কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা বর্ণনা করেছেন লেখক। যেমন সাধারণ চেহারার অধিকারী জিতেন দাশগুপ্ত[৩] সম্পর্কে নিশীথের বক্তব্য, ‘একহারা লম্বা কালো শরীর’; জিতেনের স্ত্রী নমিতার প্রসঙ্গে নিশীথের বর্ণনা, ‘ঠিক ছিপছিপে নয়, একটু মুটিয়েছে। তবু বেশ ছিমছাম, গায়ের রঙ চীনে বা বার্মিজদের মতন হলদে, হলদেটে নয়, ইংরেজ মেয়েদের মত লাগছে। বা দিশি মেয়েদের মত ফর্শা ঠিক নয়, তবে খুব বেশি দিশি মেয়ের মতোই যেন, মাঝে-মাঝে বিলিতি বলে ভুল হয়, শীতের দেশে থাকলে ওদের মতন হয়ে যেত, সুয্যিমামার দেশে থাকতে-থাকতে এ-দেশী গৌরী হয়ে যাবে একদিন। নমিতার বেশ লম্বা চুলগুলো, সোনালী প্রায়। নাক খাড়া, মুখে মঙ্গোল ছাঁচ নেই বলেই মনে হয়।’[৪] চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রেও লেখক বিশেষ্যবাচক রীতির ব্যবহার করেছেন এবং বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণের ব্যবহারও এখানে দেখা যায়। যেমন, ‘নমিতার বেশ লম্বা চুলগুলো’। বিশেষ্যের পূর্বে বিশেষণের ব্যবহার তাঁর ভাষাকে অভিনব করে তুলেছে।

(আ) চরিত্রের অন্তর্গত স্বভাব ও তার মনোভাবের বর্ণনা- চরিত্রের অন্তর্গত স্বভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক প্রায়ই প্রকৃতি থেকে উপমা সংগ্রহ করছেন। চরিত্রের ভিতরকার ভাবনা ও মনোভাব প্রকাশে তাঁর বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে তাঁর উপন্যাসে অনেক সময় বাইরের ঘটনা বা সংঘাত তেমন দেখা যায় না। তাঁর উপন্যাসে বাইরের ঘটনার প্রয়োজন অনেক সময় শুধু মাত্র চরিত্রগুলির মানসিক প্রবাহের প্রকাশের জন্যই। চরিত্রের অন্তর্গত স্বভাব তাদের মনোভাব কীভাবে তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা তা দেখে নিতে পারি—

দৃষ্টান্ত ১

> সুমনার মরুঞ্চে শালিখের মতো চোখের ঘোলাটে ভাবটা ভালো লাগছিল না নিশীথের। একটা বেড়াল...ভারী ধবধবে সুন্দর তিব্বতি বেড়ালের মতো মোটাসোটা সাদা ফনফনে লোমে লোমাচ্ছন্ন; বেড়ালটা মাদি; অর্জুন গাছের ছায়াকাটা রোদে বসেছিল; বেড়ালটার সুন্দর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ সচকিত তাকিয়ে রইল নিশীথ; মুখটা বেড়ালের না নারীর ছিল কোনোদিন![২০]
>
> [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৩৯-৪৪০]

প্রসঙ্গ- অসুস্থ সুমনাকে দেখতে নিশীথের ভাল লাগছিল না, তার তুলনায় বিড়ালটা অনেক বেশি দর্শনীয় মনে হয়। সুমনার প্রতি নিশীথের যে আন্তরিক টান আর নেই, যেটুকু আছে তা শুধুই দায়িত্ববোধ। লেখক নিশীথের মনের ভাবটি কেবল একটি বাক্যেই বুঝিয়ে দিলেন। একই সাথে সুমনা যে একদিন সুন্দরী ছিল সুন্দর বেড়ালটার মতো তা বলে লেখক অতীতের সুখের সময়টিকেও বুঝিয়ে দিলেন। একই সাথে এও বুঝিয়ে দিলেন যে নিশীথের কাছে সুমনা এখন অনুকম্পা আশা করতে পারে মাত্র।

দৃষ্টান্ত ২

> মধুমঙ্গল বুকের ভেতরে একটা ভারি নিঃশ্বাস পাতলা করে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারি হয়ে বেরিয়ে এল। তার এই নাম নিয়ে সুতীর্থও যে তাকে ঠাট্টা করত, ঠাট্টা করে সকলের সামনে তাকে ছিঁড়ে

ফেলে তারপরে কি মনে করে কাছে ডেকে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিত পুকুরের পাড়ের গাছ থেকে তার জন্যে অহেতুক অকপট পাৎ বাদাম পেড়ে আর জলের ভেতর থেকে পানফল উপড়ে এনে সে সব পুকুর দীঘির দেবাংশী মাছ আর জলঠাকুরণদের মত চোখে মধুমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকে হাতের কাছে টেনে নিত।[২১]

[*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩০]

প্রসঙ্গ- সুতীর্থ ও মধুমঙ্গল একসময়ের সহপাঠী, আজ তিরিশ বছর পর দুজনে দুই পেশায়। সেলুনে চুল ছাঁটতে এসে মধুমঙ্গলের সাথে দেখা সুতীর্থর। মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চুল কাটে সুতীর্থর। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলেও কেউ তা প্রকাশ করে না। সুতীর্থের এই না চেনা ভঙ্গিতে আহত হয় মধুমঙ্গল। অথচ সুতীর্থের সাথে তার কত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। লেখক ছেলেবেলার সেই মধুর স্নেহের ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে এই অসাধারণ প্রাকৃতিক বর্ণনার সাহায্য নিয়েছেন। ছেলেবেলার সেই স্নিগ্ধ দিন ও তাদের মধুর সম্পর্কের ছবি অনেক স্মৃতির কথা উল্লেখ করেও হয়তো এভাবে বোঝানো যেত না। বাকি বন্ধুদের থেকে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল মধুমঙ্গল আর সুতীর্থের, সেই কারণেই মধুমঙ্গলের হৃদয় আজ এত বেশি উদ্বেল হয়ে ওঠে। লেখক মধুমঙ্গলের বর্তমান অবস্থার কথা বিশদে বর্ণনা না করলেও তার মনের উদ্বেল গোপন থাকেনি।

ঘ) কাব্যিক বর্ণনা- জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে অনেক সময়ই সাধারণ ঘটনাধারা বা প্রকৃতির বিবরণ দিতে দিতে তাঁর গদ্যকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন যে তা সাধারণ বিবরণ না থেকে এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সেই গদ্য তখন দৈনন্দিন ব্যবহারিক গদ্যের থেকে অনেক আলাদা হয়ে গিয়েছে। রচনার মধ্যে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে উপন্যাসের কাহিনি নয় তার ভাষাই হয়ে উঠেছে প্রধান আস্বাদনের বিষয়। এইসব ক্ষেত্রে লেখক প্রায়ই বিশেষ্যবাচক রীতির সাহায্য নিয়েছেন। প্রচুর উপমার ব্যবহার এই ধরনের বাচন

সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাব্যিক গদ্যের অনেকাংশ জুড়েই আছে প্রকৃতি এবং জীবজগৎ। মানুষের সাথে প্রকৃতি ও জীবজগতের সহাবস্থান এই অংশে লক্ষ্য করা যায়।

দৃষ্টান্ত ১

> মাঠ জঙ্গল খোড়ো ঘর সলতের প্রদীপ একে-একে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দেখা দিয়ে চলে যায়, মনের ভিতর বিক্ষোভ জমে ওঠে কেমনতর যেন এক, মনে হয় যেন স্পেন ও গ্রিস, রেনেসাঁস, এঞ্জেলো, মুরিলো, সমস্তই সরে গেল, বাদলভেজা মাঠ অশ্বত্থ ও জঙ্গল যেখানে ময়নামতীর গান ও রূপচাঁদ পক্ষীর জন্ম হয়েছিল একদিন। বৃষ্টির ঘনঘটার ভিতর পথের সঙ্গিনী এই নদী। খোড়ো বনের ভিতর থেকে পাড়াগাঁর দুঃখিনী রূপমতীর উনুনের ধোঁয়া—পাশেই তার-বেল ও বাঁশের জঙ্গলের ভিতর থেকে ধূ ধূ মাঠের আনাচে-কানাচে যুগান্তের প্রেতিনীদের নিরবিচ্ছিন্ন রূপকথা, কোথাও একটা চিতা, খানিকটা কাঠমল্লিকার গন্ধ-আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে জোনাকি, সজনে গাছের ডালে জোনাকি, লক্ষ্মী প্যাঁচার ডাক; বাংলার মাঠঘাটের পথ দিয়ে অনেক শতাব্দী ঘুরিয়ে আনে আমাকে, প্রান্তর ও নিশুতির ফাঁক থেকে অসংখ্য মুখ উকি দেয়, কিশোরী ও পুরলক্ষ্মীদের নিরপরাধ নরম ডৌলের নিবিড় মুখ সব কাছে এসে বলে—'চিনতে পার তো?'[২২]
>
> [*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৩৮৩]

দৃষ্টান্ত ২

> নদীর মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, নিরবিচ্ছিন্ন গভীর বাতাস, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, শরীরের ভিতরে রক্ত। হেমন্তের গভীর রাত...স্টিমারের সার্চ লাইটের দিকে চীনা রেশমের মতো নরম ডানাওয়ালা অসংখ্য ধূসর পোকা উড়ে আসছে; এগুলোকে কী পোকা বলে! দু-একটা আমার হাতের উপরে মুখের উপর এসে পড়ছে—ডানার ভিতর থেকে নরম শাদা-শাদা গুঁড়ি-গুঁড়ি ঝরে পড়ছে—আলোর জন্য এরা পাগল—কচি শিশুর বুকের মতন পাখনা ধড়ফড় করছে, ডেকের চারপাশে এই সব মৃত পোকার দল মুহূর্তে-মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে, এক-একটা পাগলা ঢেউয়ের লেলিহান ঝর্ণায় সেই সব মৃত শরীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আবার একটা মৃত পোকা তুলে নেই; মাখনের মতো শাদা পালক পাখনা, ছোট্ট শরীরের মধ্যে চোখ মুখ গলা বুক পা ডানা দেহের কারুকার্যে তাজমহলের শিল্পগুণের চেয়ে একটুও কম সহিষ্ণুতা কৌশল ও যত্ন দেখায়নি তো। লক্ষ লক্ষ বার এই রকম গভীর সাধনার পরিচয় দিয়েছে এই কীটনির্মাতা।[২৩]
>
> [*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৩৮৫]

দৃষ্টান্ত ৩

> আকাশে অনেক তারা, বাইরে অনেক শীত, ঘরের ভেতর প্রচুর নিঃশব্দতা, সময়ের কালো শেরওয়ানির গন্ধের মত অন্ধকার; বাইরে শিশির পড়ার শব্দ, না কি সময় বয়ে যাচ্ছে; কোথাও বালুঘড়ি নেই, সেই বালুঘড়ির ঝিরি-ঝিরি শিরি-শিরি ঝিরি-ঝিরি শব্দ : উৎপলার ঠাণ্ডা সমুদ্রশঙ্খের মত কান থেকে ঠিকরে—মাল্যবানের অন্তরাত্মায়।[২৪]
>
> [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৮১]

প্রথম দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রচুর তৎসম শব্দের ব্যবহার, যা ধ্বনি ঝংকারের সৃষ্টি করছে। তরল 'র' ধ্বনির ব্যবহার ও স্বননশীল ধ্বনির ব্যবহারে গদ্যাংশ দুটি কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তটি পড়তে গেলেই আমাদের *বনলতা সেন* কবিতার কথা মনে আসে। তার কারণ দুটি রচনার উপমা প্রয়োগের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে।

তথ্যসূচি

১. মজুমদার, ড. অভিজিৎ। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭। পৃ. ১১৪।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

৩. পূর্বোক্ত।

৪. পূর্বোক্ত।

৫. পূর্বোক্ত।

৬. পূর্বোক্ত।

৭. পূর্বোক্ত।

৮. চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার। *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

১০. পূর্বোক্ত।

১১. পূর্বোক্ত।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. পূর্বোক্ত।

১৪. পূর্বোক্ত।

১৫. পূর্বোক্ত।

১৬. পূর্বোক্ত।

১৭. পূর্বোক্ত।

১৮. পূর্বোক্ত।

১৯. পূর্বোক্ত।

২০. পূর্বোক্ত।

২১. পূর্বোক্ত।

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

২৩. পূর্বোক্ত।

২৪. পূর্বোক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজভাষার ব্যবহার: প্রসঙ্গ জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাস

একজন লেখক তাঁর রচনায় সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবেশ-পরিস্থিতিকে প্রেক্ষাপট হিসাবে গ্রহণ করে যে 'paper reality' তৈরি করেন অথবা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের কথা বলার জন্য যে সকল পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই প্রবহমান বাস্তবকেই অনুকরণ (imitation) করতে হয়। এমনকি এই অনুকরণের সাথে লেখকের মনন, তাঁর কল্পনাপ্রতিভা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে এক নতুন জগৎ তৈরি করলেও তার মৌল ভিত্তি হিসেবে থাকে এই বাস্তব সমাজই। ফলে বাস্তব জগতের মতোই লেখকের রচনাতেও ভাষাবৈচিত্র্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। ভাষার মূলকথাই হল বৈচিত্র্য। একভাষী ভূখণ্ডের মধ্যে অঞ্চলভেদে, সামাজিক শ্রেণিভেদে, ধর্মভেদে, জাত বা বর্ণভেদে এমনকি পরিস্থিতিভেদেও ভাষার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ব্রাইট ১৯৬৪ সালে সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রথম সম্মেলনে সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "Linguistic diversity is precisely the subject-matter of sociolinguistics"। অর্থাৎ ভাষার এই বৈচিত্র্যকেই তিনি সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছেন।

সামাজিক বৈচিত্র্য (social varieties) যতই বৃদ্ধি পায় ভাষার বৈচিত্র্যও তত বৃদ্ধি পায়। ভাষার এই সামাজিক ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যটিকে অধ্যাপক ঝন্টু দাস একটি রেখচিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন[১]—

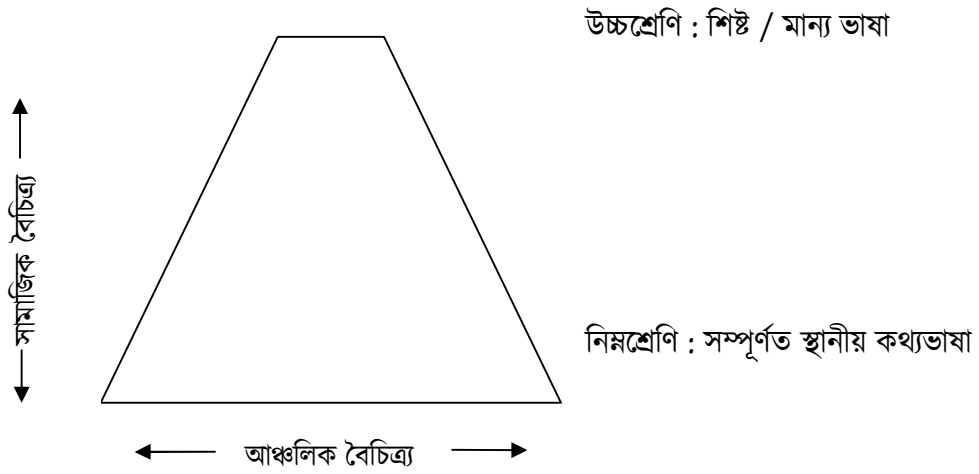

রেখচিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণির মানুষই শিষ্ট ভাষা ব্যবহার করে থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষ, যাদের অবস্থান সমাজের নিম্নশ্রেণিতে তাদের ভাষায় সামাজিক বৈচিত্র্যের চেয়ে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বেশি, এবং তারা দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় কথ্যভাষাই ব্যবহার করে থাকে। উচ্চশ্রেণির মানুষের মধ্যে রেজিস্টার ব্যবহারের প্রবণতাও বেশি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গ বদলের সাথে সাথে ভাষা ব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটে, বিষয়ের সাথে সাথে ভাষার এই হেরফেরকেই রেজিস্টার বলা হয়। উচ্চশ্রেণির মানুষের জীবনচক্র নানারকম প্রতিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে রেজিস্টার ব্যবহারের পরিমাণও বেশি।

লেখক তাঁর রচনায় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সমাজভাষার ব্যবহার করেন। কোনও একটি চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, তার পেশা সমস্তই প্রকাশিত হয় তার ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে যথাযোগ্য সমাজভাষা প্রদান করা একজন কৃতী লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আমাদের অনেকের মধ্যেই এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে শুধু ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ রচনার ক্ষেত্রেই লেখক সমাজভাষার উপর গুরুত্ব দেন। আসলে যে কোনও চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতেই লেখক সমাজভাষার শরণাপন্ন হন।

বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের ভাষা ব্যবহারের তিনটি সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন সুজান আরভিন-ট্রিপ তাঁর *Sociolinguistics* প্রবন্ধে। অধ্যাপক মৃণাল নাথ তাঁর *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থে এই সূত্রগুলির বাংলা করেছেন এই ভাবে—

১. বিকল্প সূত্র (Alternation Rules)

২. পারম্পর্য সূত্র (Sequencing Rules)

৩. সঙ্গতি সূত্র (Co-occurrence Rules)

নিম্নে এই তিনটি সূত্র কি এবং কীভাবে তা জীবনানন্দের উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিশদে আলোচনা করা হল—

১. বিকল্প সূত্র (Alternation Rules)- ভাষা ব্যবহারকারীর সামনে ভাষা ব্যবহারের জন্য কিছু বিকল্প থাকে। বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ বাক্যে সম্বোধনের ক্ষেত্রে আপনি, তুমি, তুই হল বিকল্প। এই সর্বনামগুলির মধ্য থেকেই একটি বেছে নিতে হয় ভাষা ব্যবহারকারীকে। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা, গুরুত্ব, মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি, অপরিচিতি, বয়স, বিত্ত, শ্রেণি ইত্যাদি কাজ করে। এভাবেই মধ্যম পুরুষের সর্বনামগুলি স্থির করা হয়, যা ক্রিয়াপদকেও প্রভাবিত করে। অধ্যাপক মৃণাল নাথ তাঁর *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থে অরভিন-ট্রিপকে অনুসরণ করে বাংলা ভাষার সম্ভাষণের সাধারণ নিয়মগুলিকে একটি রেখচিত্রে প্রকাশ করেছেন। এখানে সেই রেখচিত্রটি[২] তুলে ধরে হল—

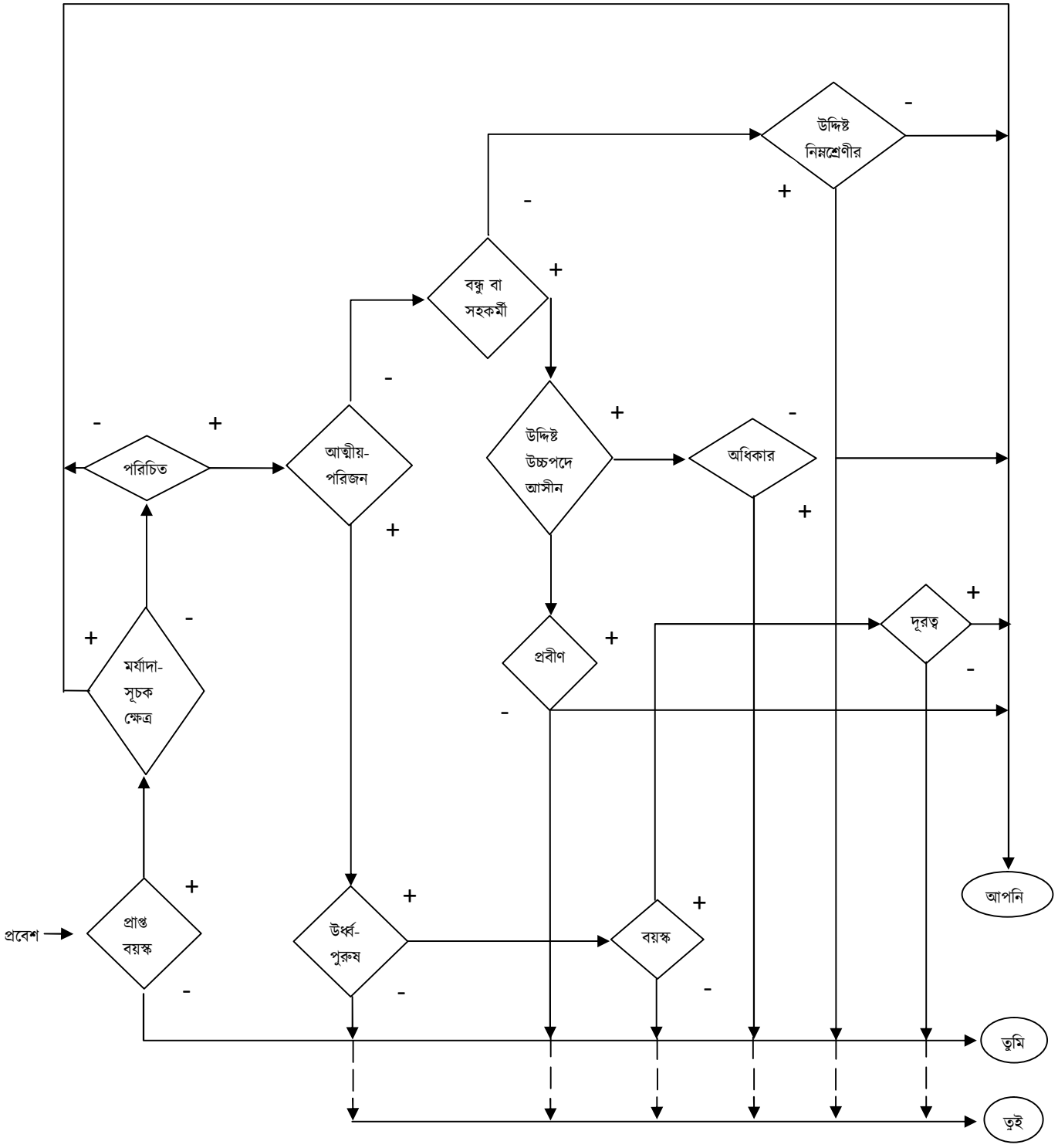

উপরোক্ত রেখচিত্রটিতে যেখানে ‘প্রবেশ’ লেখা আছে সেখান থেকে আরম্ভ করতে হবে। হীরকাকৃতি (diamond) ঘরগুলি হল ‘নির্বাচক’ (selector)। ওখান থেকে ‘+’ এবং ‘–’

অনুসরণ করে এগোতে হবে। '+' মানে হল অস্ত্যর্থন এবং '–' মানে হল নঞর্থন। তিরচিহ্ন অনুসরণ করে বিভিন্ন নির্বাচক (selector)-এর মধ্য দিয়ে গেলে পাওয়া যাবে চূড়ান্ত নির্বাচন— জানতে পারা যাবে, কাকে 'আপনি' বলা হবে, কাকে বা কোন পরিস্থিতিতে বলা হবে 'তুমি' বা 'তুই'। ভাঙা রেখা (broken line) নির্দেশ করছে 'কখনো কখনো'। রেখচিত্রটির ব্যাখ্যাটি দেখা যাক এবার, 'প্রবেশ' থেকে শুরু করে তিরপথে যেতে হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি 'প্রাপ্তবয়স্ক' হয়, মর্যাদাসূচক ক্ষেত্রেও অস্ত্যর্থন হয়, কিন্তু যদি পরিচিত না হয় তাহলে সরাসরি চলে যাবে 'আপনি' সম্বোধনে, কিন্তু যদি 'পরিচিত' হয়, তখন দেখব 'আত্মীয় পরিজন' , এভাবে বিভিন্ন 'নির্বাচক'-এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা সম্বোধনে পৌঁছতে পারব। জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে এই সম্বোধনগুলির নির্বাচন কীভাবে করেছেন তা আমরা এখানে আলোচনা করে দেখতে পারি।

কারুবাসনা উপন্যাসে দুই প্রজন্মের চরিত্র রয়েছে— ক) কথকের মা, মেজকাকা ইত্যাদি খ) কথক, তার স্ত্রী ইত্যাদি। এখানে সম্বোধন পদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা যায় পুরুষানুক্রমী ব্যবধান (genealogical distance) কাজ করেছে অর্থাৎ এক প্রজন্ম তার পূর্ব প্রজন্মের ক্ষেত্রে 'আপনি' প্রয়োগ করছে, যেমন কথক যখন তার মায়ের প্রসঙ্গে কথা বলছে বা মেজকাকার সঙ্গে কথা বলছে তখন সে 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার করছে। কথক ও তার স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ভেদ থাকলেও তারা একই প্রজন্মের মানুষ, যে কারণে তারা একে অপরকে 'তুমি' সম্বোধন করছে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ কোনও প্রভেদ নেই। এই নিয়মেই কথক তার সমবয়সী সকল নারী পুরুষ সম্বন্ধেই 'তুমি' প্রয়োগ করেছে। সে তার প্রিয় নারী মাধুরী হোক বা দোকানদার বিনয় ভট্টাচার্য। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটছে না। কথকের মেজকাকা তার দাদার সম্পর্কে 'আপনি' সম্বোধন করছে। কিন্তু একই প্রজন্মের মানুষ কথকের মা, অর্থাৎ মেজকাকার সম্বন্ধে 'বৌঠান'-কে সে বলছে, 'আমাকে ঠাকুরপো ডেকো না—বরং সুরেশবাবু ডেকো। কিংবা তাতে যদি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাটা জড়িয়ে গেছে মনে করো তা হলে

সুরেশ দা'। অর্থাৎ মেজকাকা লিঙ্গ ও বয়স সম্পর্কে বিশেষ সচেতন যে কারণে সে তার বোনকে 'তুই' সম্বোধন করছে, অথচ ভাইকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করলেও সরাসরি 'তুই' বলছে না, বরং সেখানে সে ভাববাচ্য ব্যবহার করছে। অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সম্বোধন নির্বাচনে লিঙ্গের ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে। ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে উভয় প্রজন্মেই 'তুমি' ব্যবহৃত হচ্ছে নারী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই। কথক আর তার স্ত্রীর কথা আমরা আগেই বলেছি। কথকের মা বাবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

জলপাইহাটি উপন্যাসে নিশীথ পেশায় কলেজের শিক্ষক। ইংরেজিতে এম.এ.। সে যখন বন্ধু জিতেন দাশগুপ্তর সাথে কথা বলছে তখন সে সর্বদাই 'তুমি' সম্বোধন ব্যবহার করছে। কিন্তু জিতেনের স্ত্রী একে মহিলা তার ওপর অপরিচিত তাই তার সাথে নিশীথ 'আপনি' ব্যবহার করছে। অপরদিকে স্বামীর বন্ধু নিশীথের সাথে প্রথম পরিচয়ের গণ্ডী পেরিয়ে বন্ধুত্ব হয়ে গেলেও নমিতা 'আপনি' সম্বোধনেই স্থির থেকেছে। নিশীথের কাছে স্বামীর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েও নমিতা 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার করেছে। নমিতার সাথে জিতেনের অন্তরঙ্গ সংলাপ উপন্যাসে নেই, ফলে তাদের সম্পর্কে 'তুমি' সম্বোধন ছিল কিনা তা জানা যায় না। জিতেনের নাম উচ্চারণে কুণ্ঠিত নয় নমিতা, কিন্তু সম্বোধনের ক্ষেত্রে সে 'আপনি' ব্যবহারেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এমনকি সামাজিক দিক দিয়ে সে উঁচুতে অবস্থান করলেও বাবুর্চিকে সে সর্বদাই 'তুমি' সম্বোধন করেছে। যা তার রুচির পরিচয় দেয়। এই উপন্যাসে সর্বনাম নির্বাচনে লিঙ্গ ও বয়স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অর্চনা যে কারণে সুমনাকে 'তুমি' সম্বোধন করলেও নিশীথকে 'আপনি' সম্বোধন করেছে। একই ভাবে হারীতের সাথে সে 'তুমি' প্রয়োগ করেছে, বিপরীতে হারীতও অর্চনা মাসিকে 'তুমি' বলেছে।

সুতীর্থ উপন্যাসে সর্বনাম নির্বাচন অনেক বেশি ইনফরম্যাল। মণিকা তার বাড়ির ভাড়াটে সুতীর্থকে 'তুমি' সম্বোধন করেছে। তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও রয়েছে। অন্য উপন্যাসে নারী পুরুষের মধ্যে সম্বোধন নির্বাচনের যে তফাৎ ছিল এই উপন্যাসে তা অনেকটাই কমে গেছে। বিরূপাক্ষ, বিজন, সুতীর্থ যে কারণে একে অপরকে সহজেই 'তুমি' বলেছে। সুতীর্থ রাস্তায় দেখা হওয়া বাচ্চা ছেলে শোভান ঘোষকে প্রথমে 'তুমি' সম্বোধন করে। পরে সুইচ ওভার করে সে 'তুই' সম্বোধন করে, এই সম্বোধন বদলের ক্ষেত্রে তার বয়সে বড়ো হওয়ার থেকেও বড়ো কারণ তার সামাজিক অবস্থান ছেলেটির থেকে অনেক ওপরে। নিম্নবিত্ত বাড়ির ছেলে শোভানকে তাই নিশীথ আর 'তুমি' বলেনি। অবশ্য এই সুইচ ওভারে শোভানের প্রতি সুতীর্থের করুণাও প্রকাশিত হয়। শোভানের বেশভূষার সাথে সাথে তার কথা বলার ভঙ্গিতেও তার সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। সে সুতীর্থকে বলে, "মুকে ছেড়ে দাও বাবু, পায়ে পড়ি তোমার, কলকাতার মনিষদের ভয় লাগে আমার। আমি তো তাদের কোনও অমান্য করিনি, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। আজ রাতেই মজিলপুর চলে যাব, আর কারুর পকেটে হাত দেব না। কজনকার কাটনু পকেট আমি?" শোভানের বলা কথাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শুধু বাক্যের অর্থ থেকেই নয়, বাক্য ব্যবহার থেকেও তার সামাজিক অবস্থানটি স্পষ্ট। সে নিজের ক্ষেত্রে 'মুকে' সর্বনাম ব্যবহার করছে, 'কাটনু' ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছে, শুধু তাই নয়, সে সম্মান দেখাতে গিয়ে সুতীর্থকে 'আপনি' সম্বোধন করলেও 'আপনি' সম্বোধনের সাথে কি ক্রিয়াপদ ব্যবহার সঙ্গত তা সে জানে না, যে কারণে সে বলে, 'আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে'।

এই উপন্যাসের আরেকটি দৃশ্যে বক্তা (sender) ও শ্রোতার (receiver) সামাজিক পরিচয়, তার জীবিকার ওপর কীভাবে সমাজভাষা নির্ভর করে তা ফুটে উঠেছে সুন্দর ভাবে। সুতীর্থ ও মধুমঙ্গল দুজনেই ছেলেবেলার বন্ধু, একসাথে স্কুলে পড়ত। দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারপর দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই। বর্তমানে সুতীর্থ যে সেলুনে এসেছে সেখানে নাপিত

মধুমঙ্গল। দুজনেই দুজনকে চিনতে পারে কিন্তু সুতীর্থ অপরিচয়ের গণ্ডী না ভাঙ্গায় মধুমঙ্গল সাহস পায় না। পুরনো পরিচয় প্রকাশ না হওয়াই, পূর্ব-ঘনিষ্ঠতা থাকা বা দুজনেই ভেতরে ভেতরে দুজনকে চিনতে পারা সত্ত্বেও তারা একে অপরকে 'তুমি' সম্বোধন করতে পারে না। জীবিকাই তাদের ঘনিষ্ঠতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই মধুমঙ্গল বরাবর 'আপনি' সম্বোধন করে তার দোকানে আসা 'বাবু' লোকটিকে, সুতীর্থও 'তুমি' সম্বোধন করে এবং নাম ধরে ডাকে মধুমঙ্গলকে।

মাল্যবান উপন্যাসে মাল্যবান ও উৎপলা স্বামী-স্ত্রী। তাই তাদের মধ্যে একে অপরকে 'তুমি' সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কোনও লিঙ্গ ভূমিকা নেই। তাদের দুজনের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা বা ঘনিষ্ঠতা আছে তাও না তবু তারা অভ্যাস বশে কিংবা তারা স্বামী-স্ত্রী শুধু এই কারণেই 'তুমি' সম্বোধন করে। অর্থাৎ এখানে তাদের সামাজিক পরিচয়ই সম্বোধন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পুরুষানুক্রমী ব্যবধান (genealogical distance)-এর উদাহরণ রয়েছে মাল্যবানের কথায়। যে কারণে মায়ের প্রসঙ্গে সে 'আপনি' ব্যবহার করেছে।

জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় সময়ের সাথে সাথে তাঁর উপন্যাসে সমাজভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। লিঙ্গভেদে সম্বোধনের পরিবর্তন পরের দিকের উপন্যাসে আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণত উপন্যাসে সুইচ ওভার বা সম্বোধন পরিবর্তনের সুযোগ থাকে অনেক বেশি। কিন্তু সেই সুযোগ সত্ত্বেও তাঁর ছোটগল্পে যেভাবে সুইচ ওভার পরিলক্ষিত হয় তাঁর উপন্যাসে সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর উপন্যাসে কীভাবে মধ্যম পুরুষের বিকল্পগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা বিধিবদ্ধ করা হল।

ক) আপনি সম্বোধন- আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'আপনি' সম্বোধন সম্পর্কে সমাজে যে প্রচলিত বিধি আছে তা তুলে ধরেছেন এভাবে- "মধ্যম পুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে, ভদ্রসমাজে সম্মান ও গৌরব এবং সৌজন্য-পূর্ণ সম্বোধনে "আপনি"

শব্দ ব্যবহৃত হয়। অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি এবং ভদ্রবেশী মাত্রই এই সম্মাননার অধিকারী।"[৩] এছাড়া তিনি আরও বলেছেন, "অত্যধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবার জন্য মধ্যম পুরুষে "আপনি—আপনার—আপনাকে" প্রভৃতি-স্থলে কতকগুলি বিশিষ্ট সম্মানদ্যোতক বিশেষ্য (প্রথম পুরুষে) ব্যবহৃত হয়"।[৪] উদাহরণ হিসেবে তিনি মহাশয় (মশায়), প্রভু (ধর্মগুরু বা অন্নদাতা অথবা রাজার ক্ষেত্রে), জনাব ইত্যাদি শব্দের কথা বলেছেন। জীবনানন্দের উপন্যাসে এই 'আপনি' সম্বোধনের নানান দৃষ্টান্তগুলিকে বিধিবদ্ধ করা হল—

ক) অপ্রত্যক্ষ্য সংলাপে বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে 'আপনি' প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ সংলাপে কখনো তাকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

খ) সমবয়সী মহিলারা একে অপরকে 'তুমি' সম্বোধন করলেও পুরুষের ক্ষেত্রে 'আপনি' সম্বোধন করেছে।

গ) বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকারা গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী বা তাদের আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবদের 'আপনি' সম্বোধন করেছে।

ঘ) স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সাধারণত পুরুষেরা স্ত্রীদের 'আপনি' বলেই সম্বোধন করেছে।

ঙ) স্বল্পপরিচিত বা প্রথম আলাপে পুরুষেরা 'আপনি' সম্বোধন করেছে।

চ) নাপিত বা দোকানদাররা সাধারণত ক্রেতা বা 'বাবুদের' আপনি সম্বোধন করেছে।

ছ) মাস্টার অর্থাৎ শিক্ষকদের সম্বন্ধে সব সময় 'আপনি' সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়।

জ) অফিসে একজন আরেকজনের প্রতি 'আপনি' সম্বোধন প্রয়োগ করেছে, সেক্ষেত্রে নিম্নপদস্থ কর্মী হলেও একই নিয়ম।

খ) তুমি সম্বোধন- আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'তুমি' সম্বোধন সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত যে রীতির কথা বলেছেন তা হল, "যাহারা বক্তার শ্রদ্ধা ও সম্মাননার পাত্র নহে, কিংবা শ্রদ্ধা ও সম্মাননার পাত্র হইলেও যাহাদের সঙ্গে বক্তার ঘনিষ্ঠতা

আছে, তাহাদের সম্বন্ধে, বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে, ও পদ-মর্যাদায় যাহারা বক্তা অপেক্ষা বহুগুণে হীন, তাহাদের সম্বন্ধে "তুমি" ব্যবহৃত হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহের পাত্রদের সম্বন্ধে ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের সম্বন্ধেও "তুমি" প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর ও দেবতা-সম্বন্ধেও "তুমি" ব্যবহার্য।"[৫] জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাস 'তুমি' সম্বোধন কীভাবে ব্যবহার করেছেন তা নিচে দেখানো হল—

ক) জীবনানন্দের উপন্যাসে 'তুমি' সম্বোধনই সব থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব মা-ছেলে ইত্যাদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই 'তুমি' সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়।

খ) বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে সম্বোধিত ব্যক্তি মহিলা হলে অনেকসময় 'তুমি' সম্বোধন লক্ষ্য করা যায়।

গ) বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা বয়োকনিষ্ঠদের 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেছে। যেমন—পিতা-পুত্র, পিতা-কন্যা ইত্যাদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

ঘ) বিত্ত ও অর্থের দিক থেকে যারা সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত তারা অপেক্ষাকৃত নিচের স্তরে অবস্থিত মানুষদের 'তুমি' সম্বোধন করেছে।

ঙ) কিশোর-কিশোরীদের সাথে কথা বলার সময় প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষেরা 'তুমি' সম্বোধন প্রয়োগ করেছে।

চ) ছোটো ছেলে-মেয়েরা বাবা-মাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছে।

গ) তুই সম্বোধন- আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'তুই' সম্বোধন সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত যে রীতিনীতির কথা বলেছেন তা হল, "অনাদরে ও তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়। নিজের পরিবারস্থ শিশুদের সম্বন্ধে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি স্নেহের সম্পর্কের ব্যক্তি-সম্বন্ধে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম-বয়স্ক মিত্র অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে, সাধারণতঃ এই সর্বনাম প্রযুক্ত হয়; এতদ্ভিন্ন পুরাতন ভৃত্য এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক-সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিকট আত্মীয়, বহুদিনের পরিচিত মিত্র অথবা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ না হইলে, সর্ব শ্রেণীর লোক সম্বন্ধেই "তুই"য়ের প্রয়োগ ভদ্র সমাজে বিরল হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত আদরে বা

নৈকট্য-কল্পনায়(সাধারণতঃ মাতৃ-মূর্তিতে দৃষ্ট) দেব শক্তির সম্বন্ধেও "তুই"য়ের প্রয়োগ বাঙ্গালায় দেখা যায়—বিশেষতঃ কবিতায়"।[৬] জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে 'তুই' সম্বোধন খুব বেশি ব্যবহার করেননি। একমাত্র এক নিম্নবিত্ত সমাজের শিশুকে উদ্দেশ্য করে 'তুই'-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে সুতীর্থের কণ্ঠে।

২. পারম্পর্য সূত্র (Sequencing Rules)- আমাদের সামাজিক, দৈনন্দিন বা ব্যক্তিগত জীবনে পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্য কিছু ভাষিক পারম্পর্যের রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। সমাজ জীবনে এই সকল ভাষিক পারম্পর্য পালনে আমরা সকলেই কম-বেশি অভ্যস্ত। এগুলির পূর্বানুমান ও সম্ভব। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৃণাল নাথ তাঁর *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থে বলেছেন, "প্রাত্যহিক জীবনে কারো সঙ্গে দেখা হলে যখন কথা বলা হয়, তখন ভাষীর বাক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তাতে এক ধরণের পারম্পর্য রয়েছে। যেমন একজন বলবে, "কী, কেমন আছেন", উত্তর হবে, "ভালো আছি" বা "শরীরটা তেমন ভালো নয়"। এভাবে প্রশ্নোত্তর বা আদানপ্রদান চলতে থাকবে পারম্পর্য রক্ষা করে। টেলিফোনে কথা বলতে গেলে, কাউকে সম্ভাষণ করতে গেলে, কারুর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে, সব সমাজেই বাঁধা-ধরা সমাজ নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম থাকে। তা সকলকেই সমানভাবে অনুসরণ করতে হয়।"[৭]

আরভিন-ট্রিপ এর *Sociolinguistics* প্রবন্ধ অনুসরণে অধ্যাপক মৃণাল নাথ পারম্পর্য নিয়মকে একটি সূত্রে আবদ্ধ করেছেন—

পরিচয় (Introduction) + আলাপ (Conversation) + বিদায়গ্রহণ (Leave Taking)

এক্ষেত্রে যদি প্রথম দুই অংশকে (পরিচয় + আলাপ) বাদ দেওয়া যায় তাহলে বাকি থাকে বিদায়গ্রহণ (বি-গ্র)। বিদায়গ্রহণেরও দুটি উপাদান রয়েছে দুজন অংশগ্রহণকারীর জন্য। এই উপাদানসমূহের বিশ্লেষণে আরভিন-ট্রিপ সঞ্জননী ব্যাকরণের পুনর্লিখন সূত্র (Rewrite Rule)-

এর ব্যবহার করেছেন। বিদায়গ্রহণে উভয়পক্ষের তরফেই ব্যবহৃত হয় সৌজন্যপদ (সৌ-প) তথা Courtesy Phrase। আরভিন-ট্রিপ তা এভাবে দেখিয়েছেন—

বি-গ্র → বিগ্র১ + বিগ্র২

বি-গ্র১ → Goodbye + সৌ-প

সৌ-প → { I am very glad to have met you
I hope I shall see you again (soon / sometime) }

বি-গ্র২ → Thank you (+ I hope so, too)

ওপরে ব্যবহৃত সমস্ত চিহ্নই রূপান্তরী-সঞ্জননী ব্যাকরণ থেকে গৃহীত। যুক্তচিহ্নের (+) অর্থ পরপর ঘটনাক্রম অর্থাৎ এখানে বাক্যক্রম বা সংকথনক্রম (utterances)। তির-চিহ্নের (→) অর্থ পুনর্লিখন সূত্র, এবং দ্বিতীয় বন্ধনীর অর্থ বৈকল্পিক পদ, অর্থাৎ দুটির মধ্যে যে কোনও একটি। প্রথম বন্ধনীর অর্থ ঐচ্ছিক পদ। বিদায়গ্রহণের দুটি অংশ—ক) বি-গ্র১ খ) বি-গ্র২। বি-গ্র১ পুনর্লিখিত হবে, 'Goodbye' এবং সৌজন্য পদ দিয়ে। সৌজন্য পদ আবার পুনর্লিখিত হবে 'I am very glad to have met you'। (একজনের পক্ষে এখানেই শেষ হতে পারে বিদায়গ্রহণ বার্তালাপ), অথবা আগের বাক্যটি না বলে সে বলতে পারে 'I hope I shall see you again' এই বাক্যের পরেও দুটি বিকল্প পদের একটি থাকতে পারে, আবার নাও পারে, সেক্ষেত্রে 'soon' বা 'sometime' যুক্ত হতে পারে। বি-গ্র২ হবে (অপর একজনের পক্ষে) 'Thank you' বা সে বলতে পারে, 'I hope so, too'। বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে 'গুডবাই'-এর বদলে 'চলি', 'আসছি', 'টা-টা', 'বাই', 'বাই বাই' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বাকি অংশ বঙ্গানুবাদ করলে যা দাঁড়ায় মোটামুটিভাবে সেরকমই প্রচলিত।

বিদায়গ্রহণ বাদে যে দুটি অংশ থাকে তা হল পরিচয় ও আলাপ। পরিচয় এবং বিদায়গ্রহণ আপেক্ষিকভাবে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা হলেও আলাপের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম নেই। এই 'আলাপ' ক্ষণিকের জন্য হতে পারে, আবার দীর্ঘসময় ধরেও চলতে পারে। পরিচয়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আহ্বান, প্রশ্ন, উত্তর, প্রত্যুত্তর এভাবে চলতে থাকে। আরভিন-ট্রিপ টেলিফোনের কথোপকথনের পর্যায়ক্রমটিকেও একটি সূত্রে আবদ্ধ করেছেন। আমরা 'আলাপ' অংশটিকে বাদ দিয়ে পরিচয় ও বিদায়গ্রহণ অংশ কীভাবে জীবনানন্দের উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে তা আলোচনা করে দেখতে পারি—

ক) পরিচয় অংশের নির্মাণ-

দৃষ্টান্ত ১

উপরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার উপর দিয়ে জুতো মাড়িয়ে চলতে ভ্রূক্ষেপ করেনি কেউ; যেখানে সেখানে কাদা ও সুরকির ছাপ।

আস্তে-আস্তে ধুলোগুলো ঝেড়ে নিয়ে বসলাম।

তাকিয়ে দেখলাম একজন বুড়ো মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

— 'মশাই শুনছেন?'

— 'আমাকে বলছেন?'

— 'আপনাকেই।'

— 'বলুন।'

— 'এটা কি আপনার বিছানা?'

— 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

— 'এখানে আমি একটু শুতে চাই।'

একটু হেসে—'সে আপনার অনুগ্রহ।'

— 'না, ঠাট্টা নয়।'

— 'আমিও ঠাট্টা করছি না।'

— 'দেখছেন তো কী রকম ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা আমার; আজ কম করে সাত ক্রোশ পথ হেঁটেছি—সেই হতচ্ছাড়া মিনসে জনার্দনটার পাল্লায় পড়ে', চোখ কপালে তুলে হাঁসের মতো ফোঁসফোঁস করে বুড়ো, 'মিনসে আবার আমার সম্বন্ধী—মাগের ভাই—কাজেই...

— 'বুড়ো বয়সে অনেক হাঁটিয়ে ছাড়লে দেখছি!'

— 'আমার ব্যাপারটা কী শুনুন।'

— 'বলুন।'

আমার বিছানায় হাত বুলিয়ে জায়গা খুঁজে নিয়ে বসল। কাঁধে একটা চাদর শুধু—পরনের কাপড় কোমরে জড়ানো আছে বটে, কিন্তু হাঁটু পর্যন্তও নামে নি। শনের মতন সাদা চুল, গালে মাসখানেকের সাদা দাড়ি গজিয়েছে, যেন অনেক দুঃখকষ্ট, শূন্যতা ও ধূসরতার ভিতর দিয়ে; কথা বলতে-বলতে বুড়োর মুখ যখন প্রসন্ন হয়ে ওঠে, মনে হয়, হাঁড়ির থেকে এক থাবা দই নিয়ে মানুষটির গালে খুব বেমালুম ভাবে ঘষে দিয়েছে কে যেন। চোখ দুটো থেঁতলানো বেত-ফলের মত-জায়গায় জায়গায় মরিচের রং রয়েছে।[৮]

[*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬]

স্টিমারে গল্পের কথক অর্থাৎ সুকুমারের সাথে দেখা হয় এক প্রবীণ ভদ্রলোকের। সাধারণ সহযাত্রীর মতোই কথাবার্তা শুরু হয়। প্রবীণ ব্যক্তিটি প্রথমেই তার প্রয়োজনের কথা জানায়। সুকুমার তাকে নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে এক প্রকার সাহায্য করে। তারপরেও তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে। সুকুমারের কথার মধ্যে শুধু সহযাত্রী সুলভ সৌজন্যবোধই দেখা যায় না। তার কথার মধ্যে প্রবীণ মানুষটির প্রতি একধরণের ভালবাসাও ফুটে ওঠে। বৃদ্ধের একবার মাত্র অনুরোধেই সে নিজের বিছানা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়। বৃদ্ধের সারল্যও তার ভালো লাগে। সে কারণে কৃতজ্ঞতাবশত বা স্বভাবদোষে যে কারণেই বৃদ্ধের অতিকথনেও সে শ্রান্ত হয় না। শুনতে থাকে বৃদ্ধের কথা, হয়তো অন্য কিছু করার অবকাশ না থাকাও এই মনোযোগ দেওয়ার একটা কারণ। অপরদিকে যুবকটিকেও (সুকুমারের নাম জানে না সে) ভালো লাগে বৃদ্ধের, তাই সে আরও উৎসাহিত হয়ে তার কথা বলতে শুরু করে। তাই সদ্য আলাপ হওয়া এক মানুষকেও সে তার মনের কথা অবলীলাক্রমে বলতে পেরেছে।

দৃষ্টান্ত ২

যে-বোর্ডিঙে বিনতা থাকত, সেখানে থেকে কমলা বলে আমার একটি আত্মীয়াও কলেজে পড়ছিল। একদিন কমলাদের বোর্ডিঙে গেলাম। আমাকে দেখে সে খুব খুশি।

বললে—'আপনি আসেনই না একেবারে, আমরা যেন আপনার কেউ নই, পর! কেন এ রকম ব্যবহার বলুন দেখি তো।'

অনেক দেঁতো হাসি ও পালিশ কথাবার্তার পর একটু ভরসা করে বললাম—'আমার নাম বোর্ডিঙের কোনো মেয়ের কাছে শুনেছ?'

চোখ কপালে তুলে কমলা—'তার মানে?'

একটু দম নিয়ে—'না, এমন কিছু নয়। অবাক হয়ে ভাবছিলাম আমার পরিচিত কেউ এখানে আছে কি না?'

— 'তা কী করে থাকে?'

— 'কেউই নেই বুঝি?'

— 'আমি তো থাকি।'

— 'তুমি ছাড়া আর কেউ?'

— 'এই বোর্ডিঙে? আপনার মন যে মাঝে-মাঝে কোন জগতে চলে যায়?'

— 'সত্যিই নেই কেউ? কী বলো কমলা?'

— 'ঠাট্টা রাখুন-আমাকে একটু লজিক বুঝিয়ে দেবেন?'

— 'লজিক? আর-এক দিন। এই বিষ্যুদবার।'

একটু চুপ থেকে বললাম 'আচ্ছা উঠি।'

— 'আচ্ছা। আর-এক দিন আসবেন কিন্তু!'

উঠবার আগে সাহস করে জিগেস করে—'বিনতা বলে কোনো মেয়ে থাকে এই বোর্ডিঙে?'

— 'বি. রায়?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'হ্যাঁ আছেন। থার্ড ইয়ারের মেয়ে। অদ্ভুত রূপসী। কলেজে এ-রকম একটি মেয়েও নেই আর। টেবলোতে বিনতাদি মিশরের রানী সাজেন।'

— 'মিশরের রাজা সাজে কে?'

— 'সে আর-একটি মেয়ে, জাঁদরেল।'

অনেকখানি সাহস জুগিয়ে নিয়ে—'মিশরের রানীকে একটু ডেকে দিতে পারবে আমার কাছে?'

খানিকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে কমলা—'নিয়মের কড়াকড়ি বিশেষ নেই, কিন্তু আপনাকে চেনেন তো তিনি?'

— 'চেনেন বলেই তো মনে হয়।'

মিনিট পাঁচেক পরে কমলা ফিরে এসে বলল—'এই আধ ঘণ্টা হল তিনি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বেরিয়ে গেছেন! আচ্ছা আপনার কথা বলব আমি তাকে।'

— খবরদার, ভুল করেও কিছু বলতে যেও না কমলা।'

ঐকান্তিক ভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—'বলো, বলবে না?'

একটু হেসে—'কেন?'

— 'না। বলবার মত কিছু জিনিস নয়।'[৯]

[*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৪০৪-৪০৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে কথক অর্থাৎ সুকুমার বোর্ডিঙে কথা বলতে গিয়েছে কমলার সঙ্গে। কমলা তার পূর্বপরিচিত। কিন্তু অনেকদিন পর দেখা হয়েছে। যে কারণে কমলা বেশ উৎসাহী। সে আগ্রহের সাথে কথা বলছে সুকুমারের সাথে। কিন্তু সুকুমারের মধ্যে সেই আগ্রহ বা উৎসাহ নেই। কেননা সে কমলার সাথে দেখা করতে আসলেও তার আসল লক্ষ্য কমলা নয়, বিনতা। সে বিনতার কাছে পৌঁছতে চায়। এখানে কমলা বিনতার কাছে পৌঁছনোর উপায়মাত্র। যে কারণে সে কমলার প্রতি মনযোগী নয়। যে কারণে সে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পেরেছে ততক্ষণ তাকে অস্থির দেখিয়েছে। সে উঠি উঠি করেও যেন উঠতে পারছিল না। যখন বিনতার প্রসঙ্গ উঠেছে তখন সে যথেষ্ট মনযোগী। কমলার কথা তখন সে গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে। কিন্তু যখন জানতে পারে যে বিনতা নেই এখন বোর্ডিঙে। কমলা তাকে বলে যে বিনতা আসলে তার কথা জানিয়ে দেবে। তখন আবার অস্থির দেখায় সুকুমারকে। সে তার বোর্ডিঙে আসার কথা গোপন করতে চায়। তাই সে কমলাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তার এই উপস্থিতি এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, ফলে তা বিনতাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। যে সুকুমারের কথাবার্তায় মনোযোগের ঘাটতি ছিল, যে সুকুমার কমলার প্রতি আলাদা গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিল, যার মাথার মধ্যে ছিল শুধুই বিনতার চিন্তা, সেই সুকুমার কমলার প্রতি আলাদা attention দিতে বাধ্য হয়। সে মরিয়া হয়ে অনুরোধ করে কমলাকে, সে যেন কোনভাবেই বিনতাকে তার বোর্ডিঙে খোঁজ করতে আসার কথা না জানায়।

দৃষ্টান্ত ৩

'আপনাকে ডাকছিলুম—'

'আপনি? কই শুনিনি তো।'

'ঘুমুচ্ছিলেন।'

'নীচে গিয়েছিলেন আপনি মিসেস দাশগুপ্ত?'

'যাচ্ছিলুম। আপনার ঘরেই জেতুম একবার। কয়েকবার সিঁড়ির ওপর থেকে ডেকেছি।'

'সিঁড়ির থেকে?'

'শুনতে পেয়েছিলেন? প্রত্যেকবারই দু-এক ধাপ নেমে, শেষের বার সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপ থেকে ডাকছিলুম। ঘুমুচ্ছিলেন। শোনেন নি। কাল রাতে অনেক জেগেছেন আপনি। উনি বলছিলেন আপনি জেগে উঠলে—'

'কখন গেলেন অফিসে—'

'সাড়ে ছটায়। আমি তখন জেগে উঠতে পারি নি।'

'ও'—নিশীথ বললে।

'গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে স্টার্ট দিচ্ছেন, ঘুমের ভিতর দিয়ে কানে গেল যেন আওয়াজটা—তবে আমাদের মোটর—না অন্য কারু—কোনো শিখ ড্রাইভার হয়তো গেটের পাশে এসে—কলকাতার ড্রাইভারগুলো বড্ড জ্বালাতন করে; ঘ্যাড়-ড়-ড়-ড়-ড়-ড়—এত সহজেই তাদের গাড়ির কল বিগড়ে যায়—আর শেষ রাতে যখন মানুষ ঘুমুচ্ছে তাদের চড়াও করে ফুঁড়তে-ফাড়তে না পারলে চলে না যেন আর। সাদাওয়ালা পিলাগ—আর—'

'পিলাগ?'

'মানে প্লাগ—সাদা প্লাগ—সাদা প্লাগে কিছু বিগড়েছে আর কি? বেশ তো বাবা বিগড়েছে, আমাদের কান টানছিস কি রে?'

'পি-সি রায়', নিশীথ শুরু করলে, 'মাড়োয়ারিদের ঠিক ধরেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন আচার্য রায়, বাংলাদেশের অনেক কিছুই মাড়োয়ারিদের কবলে চলে গেল। সকলেই নিচ্ছে খাচ্ছে। পুরনো ফিরিস্তি সব। তবে দিনরাত আমাদের বাসে চড়তে হচ্ছে, মাড়োয়ারি-ফাড়োয়ারির চেয়ে এ সব ড্রাইভার-কনডাকটারদের সঙ্গেই ঘেঁষাঘেঁষি। এক-একটা পদ্মার ইলিশ সাজিয়ে পাটাতন আটকে দেয়, খণ্ড-খণ্ড নুন বরফ মাখিয়ে চালান দিতে হবে। শক্তের হাতে নরম আমরা—এ-রকম অসাড়; এ-রকম অসাড় অপদার্থ বলেই দিনের পর দিন ওরা বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এর একটা বিহিত করা উচিত।'[১০]

[*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৩]

উপন্যাসের এই অংশেই প্রথম মিসেস দাশগুপ্ত অর্থাৎ নমিতার মুখোমুখি হয় নিশীথ। তার আগের রাত্রে বন্ধু জিতেনের কাছে সে তার বিবাহের কথা শুনলেও তার স্ত্রীর সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়নি। আজ সকালেই প্রথম দেখা। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে জিতেনও অনুপস্থিত। ফলে নিশীথ আর নমিতার কথোপকথন প্রথমে ছোট ছোট বাক্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যের

আদান-প্রদান কিছু কুশল বিনিময় এই সব দিয়ে শুরু হয় তাদের পরিচয় পর্ব। স্বামীর বন্ধু হলেও নিশীথ নমিতার কাছে অচেনা ব্যক্তি। যে কারণে তার কাছে সে স্বামীর প্রসঙ্গে 'আপনি' সম্বোধন করে। তারপর প্রাথমিক পরিচয়টুকু পেরিয়ে গেলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে শুরু করে। নিশীথ ও নমিতা দুজনেই উচ্চশিক্ষিত ফলে তাদের মধ্যে জড়তা তেমন নেই। তাই অপরিচয়ের গণ্ডী তারা সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছে। তার ওপর নিশীথ জিতেনের অতিথি, ফলে অতিথি সেবার ভার নমিতার ওপরেই। ফলে জড়তা তার কাছে আকাঙ্ক্ষিতও নয়। তার ওপর এমন বিষয় এসে পড়ে তাদের কথার মধ্যে যা নিয়ে দুজনেরই যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তা সে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও। ফলে তারা প্রায় একই সুরে কথা বলেছে এক সময়। যা তাদের 'পরিচয়'কে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেমন সাহায্য করেছে তেমনই তাদের 'আলাপ'কেও সহজ করেছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় তাদের পরিচয়পর্বে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই। এমনকি পুরো বাড়ির মধ্যেই পরিচারক ছাড়া আর কোনও ব্যক্তি ছিল না। যা তাদের পরিচয়ের পথ আরও মসৃণ করেছে।

দৃষ্টান্ত ৪

'কি হয়েছে, সুতীর্থ?'

'এই যে চা খাচ্ছি।'

'চা তো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছ যে—'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'একটু গরম চা পেলেই ভাল হত মণিকা দেবী, গলায় একটু ব্যথা মনে হচ্ছে—'

'ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি। আচ্ছা, আমি চা গরম করে দিতে বলছি। তুমি এই চা-টাই খাবে তো।'

এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে সুতীর্থ বললে, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই খাব। কাপসুদ্ধু চা ফেলে দিয়ে আমাকে নতুন চা তৈরি করে দেবে রামচরণ? আজকাল এক পেয়ালা চায়ের দাম তো—'

'আচ্ছা, আমিই উঠি, নিয়ে আসি ঠিক ক'রে। উনুনে কিছু চড়েছে নিশ্চয়, সেই তো মুশকিল; তুমি বড় দেরি করে ফেল ঘুম থেকে জেগে উঠতে—' বলে মণিকা দেবী বসেই রইলেন তবু।

বললেন, 'আমার বাড়ির ভাড়াটা, সুতীর্থ—'

'দিচ্ছি। আমারই দোষ হয়েছে। ও মাসেরটা দেওয়া হয়নি বুঝি। এ মাসও তো ফুরিয়ে এল প্রায়। তা ছাড়া আগের আট দশ মাসেরও বাকি আছে, সেগুলো পরে দেব। টাকা যে নেই তা নয়, কিন্তু—'।[১১]

[*সুতীর্থ*, পৃ. ৬১৭]

সুতীর্থ ও মণিকা একে অপরকে দীর্ঘদিন চেনে। তাদের পরিচয় একজন ভাড়াটে, আরেকজন বাড়ির মালকিন। বাড়ির কর্তা অংশুবাবু অসুস্থ, যে কারণে সমস্ত দেখাশোনার ভার মণিকার ওপর। শুধু ভাড়াটে ও মালকিন সম্পর্কে আটকে নেই তারা। তাদের মধ্যে একধরণের বন্ধুত্ব আছে, যা তাদের কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়। তাদের কথার মধ্যে শুধু প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে ফেলার বিষয় নেই। এখানে অবশ্য মণিকার কথার শুরু থেকেই একটি বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ লুকিয়ে ছিল। সে বিষয়ে সুতীর্থও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মণিকা তখনও সেই বিষয়ের উত্থাপন করতে পারেনি যে কারণে সে নিজেই সুতীর্থর চা গরম করে দেওয়ার কথা বললেও উঠে চলে যেতে পারছিল না। কেননা সে এতক্ষণ ধরে সেই বিশেষ কথা বলার যেমন প্রস্তুতি নিচ্ছিল তেমনই কথা উত্থাপনের ভূমিকা হিসেবে প্রাথমিক কুশল-বিনিময়পর্ব টুকুও সেরে নিচ্ছিল। এই অবস্থায় যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত তখন সেই কথা না বলে তার পক্ষে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে রামচরণ উনুনে কিছু রান্না চড়িয়েছে কিনা এই অজুহাতে বসে থাকে। তারপর সে বাড়ি ভাড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, যার জন্য সে অপেক্ষা করেছিল এতক্ষণ। সুতীর্থ বাড়ি ভাড়ার বিষয়টি এমন ভাবে শোনে যেন তা খুবই সাধারণ কোনও কথা। এবং এই অত্যন্ত সাধারণ হওয়াতেই তার মনে ছিল না। তার যে বেশ কয়েক মাস বাড়ি ভাড়া বাকি তা সে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু এমনভাবে প্রকাশ করে মণিকার কাছে যাতে বিষয়টির গুরুত্ব হ্রাস পায়। এক মুহূর্তের জন্য যে কারণে মণিকা কঠিন হয়েও বেশিক্ষণ সেই কাঠিন্য ধরে রাখতে পারে না, কেননা তার সাথে সুতীর্থের একটি সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে যা তাকে রূঢ় হতে বাধা দেয়।

দৃষ্টান্ত ৫

কিন্তু নেটের মশারি তুলতেই ব্যাপারটা হল অন্যরকম। উৎপলা জেগে উঠে প্রথম খুব খানিকটা ভয় খেলে; তারপর বিছানার ওপর উঠে বসে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে—মুহূর্তেই সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরা নদীর বালির চেয়েও বেশি বিবসতায় বললে, 'তুমি!'

'এসেছিলাম।'

'এ সময় তোমাকে কে আসতে বললে।'

'দেখতে এলাম, তোমরা কী করছ।'

'যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে যাও, কাল থেকে এ আমার সঙ্গে আর শোবে না। মেয়েটার দাবনা ঘেঁষে, বাপ রে, একটা ডান যেন।'

'কে, আমি?' মাল্যবান দাঁড়িয়ে থেকে বললে। খাটে বসল না, একটা কৌচে বসে বললে, 'না, মেয়েটিকে শুধু দেখতে আসি নি, আমি—'

'আ, গেল যা! বসলে! রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ও মা। ও মা!—ও মা! বেরোও! বেরোও বলছি!'

'তুমি ঘুমুচ্ছিলে—তোমার ঘুম ভাঙাতে আসি নি তো আমি—'

'বলি, বলির কুমড়ো, দু-ফাঁক হবে, না এখানে থাকবে?'

'ঘুমুচ্ছিলে, ঘুমোও।'

'ঘুমুচ্ছিলে ঘুমোও! আর, গোঁসাইয়ের কুমড়ো—'

'কেন কুমড়ো-কুমড়ো করছ, উৎপলা—'

'এখানে বসে থাকা চলবে না এখন।'

'আমি একটু চুপ করে বসে আছি, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। আমি এই কৌচে বসে আছি, মনু ঘুমুচ্ছে; ঘুমিয়ে পড়ো।'

উৎপলা গলাটা পরিষ্কার করে নিল, একটানা ছঘণ্টা ঘুমিয়ে বেশ সজীব সুস্বাদ হয়েছে শরীর, সরস কঠিন গলায় বললে, 'দরমুজ দিয়ে ইঁদুর মেরে ফেলেছি সব আমার ঘরের। তবুও যদি এক-আধটা থাকে জার্মান কল পেতে রেখেছি। ও সব চালাকি চলবে না। ঘুম বড় বালাই আমার। চাও তো নীচে চলে যাও।'[১২]

[*মাল্যবান*, পৃ. ৭৭৭]

এই পরিচয় অংশে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন দেখতে পায় আমরা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ ঘনিষ্ঠ কথোপকথন নয়। এখানে দেখা যায় উৎপলা প্রথম থেকেই মাল্যবানের উপর বিরক্ত। প্রথমে এই ধারণা হতে পারে যে এই বিরক্তির কারণ হয়ত অসময়ে তার ঘুম ভাঙানোর জন্য। কিন্তু সময় যত এগোতে থাকে তত বোঝা যায় এই বিরক্তি তাৎক্ষণিক নয়, এই বিরক্তি দীর্ঘকাল ধরে পোষণ করা

হয়েছে। এতে উৎপলার মাল্যবানের প্রতি বিরূপতা যেমন প্রকাশিত হয় তেমনই মাল্যবান চরিত্রের অন্তঃসার শূন্যতার দিকটিও প্রকাশিত হয়। মাল্যবানকে নিচে পাঠানোর জন্য উৎপলা যেন যে কোনও কিছু করতে রাজি। যে কারণে সে প্রথমে বলে মেয়েকে কাল থেকে মাল্যবানের কাছে শুতে পাঠাবে তাতেও সে নিচে না গেলে তখন জার্মান ইঁদুর কলের কথা বলে। এতে তার প্রতি উৎপলার বিরূপ মনোভাব যে কতটা তীব্র তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খ) বিদায়গ্রহণ অংশের নির্মাণ- বাস্তব জীবনে যেভাবে প্রথা মেনে বিদায়গ্রহণ অংশ তৈরি হয়, জীবনানন্দের উপন্যাসে সে জিনিস প্রায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'আলাপ' অংশের মধ্যেই বিদায়গ্রহণ লুকিয়ে থাকে। কখনো বা লেখক ইচ্ছে করেই 'প্রথা' মেনে বিদায়গ্রহণকে এড়িয়ে চলেন। উদাহরণ হিসেবে প্রেতিনীর রূপকথা উপন্যাসের নাম করা যায়, সেখানে দেখা যায় স্টিমারে সুকুমারের সাথে এক বৃদ্ধের পরিচয় হয় (সে তার নাম বলে হর্ষবর্ধন), সৌজন্যবশত সুকুমার তাকে তার বিছানা পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। তারপর বৃদ্ধ শুয়ে পড়ে, এবং বলে সে ঘুমিয়ে পড়লে তাকে যেন না ডাকে। তারপর সুকুমারের সাথে দেখা হয় বনবিহারীর, যে তার পূর্বপরিচিত। তার সাথে অনেক কথা হয় সুকুমারের। নানান পুরনো দিনের কথা উঠে আসে তাদের কথোপকথনে। ফটিকের প্রসঙ্গ আসে, চারুর প্রসঙ্গ আসে, বনবিহারী সুকুমারকে তার সাথে মদ্য পানের আহ্বান করে, এমনকি তার পূর্ব জীবনের কথাও এসে পড়ে। মাঝে একবার বৃদ্ধের পাশে এসে সুকুমারের শোয়ার প্রসঙ্গ ছাড়া বৃদ্ধের আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। বৃদ্ধের সাথে এভাবেই বিদায়পালা কাটে। এরপর বনবিহারীর সাথে একধরণের বিদায়গ্রহণ অংশ অনুষ্ঠিত হয় ঠিকই কিন্তু কিছু পরেই বনবিহারী ফিরে আসে এবং জানায় যে ট্রেন ছাড়তে দেরি করছে। এরপর বনবিহারীর সাথে আর বিদায়ের কোনও ঘটনা নেই, যেখানে বিদায়ের অংশ রচিত হতে পারত, বিনতা এসে সেই স্থান অধিকার করে নেয়। এরপর সুকুমার অর্থাৎ গল্পের কথক বিনতার প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ে। সেখানে বনবিহারীর প্রসঙ্গ হারিয়ে যায়। এভাবে শিকলের

মতো এগোতে থাকে গল্প যেখানে কোনও প্রসঙ্গ শেষ হয়তো ঠিকই কিন্তু আলাদা করে বিদায়গ্রহণ অংশ তৈরি হয় না।

জলপাইহাটি উপন্যাসে নিশীথ অসুস্থ স্ত্রী সুমনাকে ছেড়ে শহরে যাচ্ছে বন্ধু জিতেন দাশগুপ্তের কাছে, উদ্দেশ্য তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো, সম্ভব হলে হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজ করা। নিশীথ তার দীর্ঘদিনের কলেজের চাকরি একপ্রকার ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছে। ছেলে হারীতও বাড়ি ছাড়া। এ অবস্থায় নিশীথের বাড়ি ছেড়ে শহরে যাওয়ার ঘটনায় নাটকীয় বিদায়গ্রহণ প্রত্যাশিত। কিন্তু জীবনানন্দ সেই পথে একদম হাঁটলেন না। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে যেমন আবেগে ভেসে যাওয়া লক্ষ্য করা যায় না। তেমনই নাটকীয়তাও বিশেষ নেই। ইচ্ছে করেই যেন তিনি নাটকীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে চলেছেন। যে কারণে প্রথাগত বিদায়গ্রহণও তাঁর উপন্যাসে বিশেষ নেই।

৩. সঙ্গতি সূত্র (Co-occurrence Rules)- অধাপক মৃণাল নাথ আরভিন-ট্রিপকে অনুসরণ করে তাঁর *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থে বলেছেন, 'সঙ্গতি সূত্র নির্দিষ্ট করে কোনো ভাষিক একক সঙ্গতিপূর্ণভাবে কীভাবে একে অপরের সঙ্গে আগে-পরে বসবে। বাঙলায় এর একটি চালু উদাহরণ আছে "মৃতদেহ দাহ করা" অর্থে। তা হল "শব দাহ" এবং "মড়া পোড়া"। পদসংহতিদ্বয়ে, "শব"-এর সঙ্গে (অর্থাৎ পরে) "দাহ"-ই বসতে পারে, "পোড়া" নয়, আবার "মড়া"-র সঙ্গে "পোড়া" বসবে, "দাহ" নয়।'[১৩] সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ভাষা ব্যবহারকারীর মধ্যে এক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয় যা তার ভাষা ব্যবহারের এই সঙ্গতি রক্ষা করে। আরভিন-ট্রিপের মতে এই সঙ্গতি দুই ধরনের হয়। শব্দগত নির্বাচনকে তিনি বলেন অনুপ্রস্থ (horizontal), যেহেতু তা পরপর শব্দ সাজানোর উপর নির্ভরশীল। আরেক ধরনের সঙ্গতি সূত্র

আছে, যাকে তিনি বলেন আলম্ব (vertical), তা ভাষার সংগঠনের প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

ক) অনুপ্রস্থ সঙ্গতি (Horizontal Co-occurrence)-

১. বিশেষ্য + বিশেষ্য

দুঃখকষ্ট, কাপড়-জামা, আনাচে-কানাচে, কাপড়-চোপড়, মাঠঘাট, ঠোকাঠুকি, চিড়বিড়, নিত্যদিন ইত্যাদি।

[*প্রেতিনীর রূপকথা*]

চোরা বাজার, চাকরি-বাকরি, আজ-কাল, শহর-গ্রাম, ভদ্র-অভদ্র, কলেরা-বসন্ত, ছিটকে-লটকে, ধীরে-সুস্থে, অসুখ-বিসুখ, স্যুট-টাই, আত্মীয়-স্বজন, ডালভাত, চোখে-মুখে, গাঁ-মহকুমা, হিন্দু-মুসলমান, শিক্ষা-দীক্ষা, কলেজ-স্কুল, ইস্কুল-কলেজ, শুক্কুর-শনি, হাত-পা, দরজা-জানালা, টাকাকড়ি, সাত-পাঁচ, চা-কফি, একবার-দুবার, ঘর-দোর, বাবা-মা, ট্রাম-বাস, শাড়ি-কাপড়, কায়দা কানুন, সোফা-কৌচে, সভা-সমিতি, ভাবগতিক, ঘর-বাড়ি, হেমন্ত-শীতের, চিন্তা-টিন্তা, সাত-সকালে ইত্যাদি।

[*জলপাইহাটি*]

ছেলেপুলে, দিশপাশ, খোঁজখবর, চুপচাপ, আনাচকানাচ, ছিটেফোঁটা, স্তিমিত মন্থর, সাতসতেরো, দাবি-দাওয়া, মুখ-পিঠ, জনপ্রাণী, রাত বিরেত, ঝাড়জঙ্গল, চাকর বাকর, চেলা-চেংড়ী ইত্যাদি।

[*সুতীর্থ*]

২. বিশেষণ + বিশেষ্য

পচা হোগলার বেড়া, মেজকাকা, ম্লেচ্ছ বই, শাদাসিধে মেয়ে, লাট সাহেব, পশ্চিমি মুসলমান, অলস নিষ্কর্মা লোক, ছোটকাকা ইত্যাদি।

[*কারুবাসনা*]

নীল গাই, কাঁটা-চামচ, নীলাভ মেঘের পাহাড়, নগ্ন দুধ, শাদা শরীর, গভীর ধবল ধোঁয়া, সাহেব চেকার, ঝাঁকড়া ঝুরিওয়ালা বটগাছ, গ্রামদেবতা, জনমানবহীন অন্ধকার সেলুন,একনিষ্ঠ ঘুম, অশরীরী দেবতা ইত্যাদি।

[*প্রেতিনীর রূপকথা*]

খ) আলম্ব সঙ্গতি (Vertical Co-occurrence)- ভাষার সাংগঠনিক স্তর নির্বাচনই আলম্ব সঙ্গতির মূল কথা। অর্থাৎ বিধিগত (formal) ভাষায় যদি বিধিবাহ্য (casual) রীতির অনুপ্রবেশ ঘটে বা বিধিবাহ্য (casual) ভাষার মধ্যে যদি বিধিগত (formal) রীতির প্রবেশ ঘটে তখন হয় আলম্ব সঙ্গতির লঙ্ঘন। এই বিষয়ে অধ্যাপক মৃণাল নাথ তাঁর *ভাষা ও সমাজ* গ্রন্থে বলেছেন, 'কোনো নির্দিষ্ট বাক্যবন্ধে কোনো বিশেষ শব্দাবলিই ব্যবহৃত হতে পারে, তাদের ধ্বনিগত স্বরূপও বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।'[১৪] এখানে পরিবেশ পরিস্থিতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থান-কাল শুধু নয় পাত্রভেদেও ভাষার পরিবর্তন ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সঙ্গতির দৃষ্টান্তগুলি রেজিস্টারের মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহার ও ব্যবহারক্ষেত্র অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ অনুসন্ধান করলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। আর জীবনানন্দ যে সমাজভাষা বিষয়ে সচেতন ছিলেন তাও বোঝা যাবে।

১. মেয়েলি ভাষা

দৃষ্টান্ত ১

> তুমি কী বেকুব! তোমাকে দুধ খাবার জন্য চারটে পয়সা দিলাম আমি, হাত-পা রোগা বকের মতো হয়ে যাচ্ছে, কোথায় দোকানে বসে খেয়ে আসবে, না, সেই দুধ তুমি এতটা পথ বয়ে আনলে আমার জন্য![১৫]
>
> [*কারুবাসনা,* পৃ. ২১৪]

উদ্ধৃতাংশটির বক্তা কল্যাণী। সে তার স্বামীকে বলেছে এই কথা। কল্যাণী একজন শিক্ষিতা গৃহবধূ, ফলে তার কথার মধ্যে তেমন মেয়েলি টোন নেই যা দেখলেই সহজে বোঝা যাবে সংলাপটি

কোনও মহিলার। কাজেই এখানে সাধারণ ভাবে প্রসঙ্গটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু বিশদে সংলাপটি পড়লে বোঝা যায় এখানে এক বিশেষ মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে যা পুরুষের ভাষা ব্যবহারে এভাবে প্রকাশ পায় না। যা মেয়েদের নিজস্ব সম্পদ। এখানে কল্যাণী তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বললেও স্বামী যেন তার কাছে স্নেহের পাত্র। আসলে স্বামীর দারিদ্রের প্রতি কল্যাণীর করুণাই এখানে তার ভাষা ব্যবহারে এরকম মমত্ব এনে দিয়েছে।

দৃষ্টান্ত ২

> তা হলে তুমি কি বলতে চাও, দরজা-জানালা বন্ধ করে এক হাত ঘোমটা টেনে তুমি ওপরের বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে নীচের চৌবাচ্চায় যাব—ওপরের বারান্দায় ভিড় জমিয়ে দিয়ে ওদের মিনসেগুলোকে কামিখ্যে দেখিয়ে দিতে?[১৬]
>
> [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৮৩]

উদ্ধৃত সংলাপটির বক্তা উৎপলা। সে নিজেই সংলাপের মধ্যে নিজেকে 'মেয়েমানুষ' বলে তার পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু সে যদি তার এই পরিচয় প্রকাশ নাও করত তবু পাঠকের বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হত না। তার কারণ 'মিনসে' এই ইতরেতর শব্দের উপস্থিতি। যা পুরুষ মানুষের ভাষা ব্যবহারে সচরাচর দেখা যায় না। এক্ষেত্রে বিধিগত রীতির মধ্যে বিধিবাহ্য শব্দের প্রবেশ ঘটেছে মনে হলেও যেহেতু সংলাপটির শ্রোতা উৎপলার স্বামী অর্থাৎ তারা সামাজিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত তাই আর সে প্রসঙ্গ মনে আসে না। এক্ষেত্রে ওই একটি শব্দই উৎপলার পরিচয় প্রকাশ করে দেয়। জীবনানন্দ খুব বেশি স্ল্যাং ব্যবহার না করলেও যেখানে ভাষার তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা বোঝাতে চেয়েছেন সেখানে মাঝে মাঝেই উনি স্ল্যাং-এর শরণাপন্ন হয়েছেন।

২. শিক্ষকের ভাষা

দৃষ্টান্ত ১

> মাড়োয়ারিদের ঠিক ধরেছিলেন। ঠিকই বলেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন আচার্য রায়, বাংলাদেশের অনেক কিছুই মাড়োয়ারিদের কবলে চলে গেল। সকলেই নিচ্ছে খাচ্ছে। পুরনো ফিরিস্তি সব। তবে দিনরাত

আমাদের বাসে চড়তে হচ্ছে, মাড়োয়ারি-ফাড়োয়ারির চেয়ে এ সব ড্রাইভার-কনডাকটারদের সঙ্গেই ঘেঁষাঘেঁষি। এক-একটা পদ্মার ইলিশ সাজিয়ে পাটাতন আটকে দেয়, খণ্ড-খণ্ড নুন বরফ মাখিয়ে চালান দিতে হবে। শক্তের হাতে নরম আমরা—এ-রকম অসাড়; এ-রকম অসাড় অপদার্থ বলেই দিনের পর দিন ওরা বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এর একটা বিহিত করা উচিত।[১৭]

[*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৩]

উদ্ধৃত সংলাপ অংশটির বক্তা নিশীথ। সে পেশায় কলেজের শিক্ষক। তার কাছ থেকে এই ধরনের সংলাপই কাঙ্ক্ষিত। যা হবে মার্জিত, যেখানে রুচির ছাপ থাকবে। যে সংলাপে থাকবে তার উর্বর ভাবনার প্রতিফলন। এটি বিধিগত রীতির সংলাপ। এখানে শ্রোতা বন্ধুর স্ত্রী। যার সাথে আলাপও কিছুক্ষণের ফলে বিধিবাহ্য রীতির ব্যবহার না হওয়াই স্বাভাবিক। রেজিস্টার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই একই চরিত্রের মুখে শোনা যায় বিধিবাহ্য অন্য রকম সংলাপ।

৩. নাপিতের ভাষা

দৃষ্টান্ত ১

তর লোগ পাগলের লাহান কথা কইছে ক্যাডা? কথার লওন আছে থোওন নাই মানুষটা ক্যাডা? এই দুফুইবডার সময় নি চুল ছাঁটে। চুল ছাঁটতে আইছে না চুলের আঁটি বাঁধতে—দল ঘাসের আঁটি—ছলিমদ্দি সইসের লাহান?[১৮]

[*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩২]

দৃষ্টান্ত ২

সে গুড়ে অনেকদিন বালি প'ড়ে গেছে, স্যার। আমাদের কোনো চেনা বাড়িউলি নেই, বাড়িই নেই, লোকের মাথা পাতবার জায়গা নেই। মন্বন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব; হাড়গোড়ের ছিঁবড়ে শুঁকতে আরশোলারা শুঁড় নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, ফড়-ফড় করছে।[১৯]

[*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩২]

উদ্ধৃত সংলাপ দুটির প্রথমটির বক্তা বিপিন, দ্বিতীয়টির বক্তা মধুমঙ্গল। প্রথম সংলাপের শ্রোতা মধুমঙ্গল। দ্বিতীয় সংলাপটি উচ্চশ্রেণির প্রতিনিধি সুতীর্থকে উদ্দেশ্য করে বলা। মধুমঙ্গল হেডনাপিত। বিপিন তার চেয়ে নিম্ন শ্রেণির। বিপিনের ডায়ালেক্ট ওপার বাংলার। বিপিনের ভাষা

মধুমঙ্গলের ভাষা থেকে যে এত আলাদা তার কারণ দুজনের রেজিস্টার। বিপিন এখানে বিধিবাহ্য রীতির ব্যবহার করেছে, কিন্তু মধুমঙ্গল কথা বলেছে বিধিগত রীতিতে। মধুমঙ্গল যখন বিপিনের সাথে কথা বলে তখন তার ভাষা ব্যবহারও অনেক পাল্টে যায়। অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় সংলাপটির শ্রোতা সুতীর্থ না হয়ে বিপিন হত তবে তা অমার্জিত হত, শুধু শব্দ নির্বাচনের দিক থেকে না উচ্চারণের দিক থেকেও আরও তীক্ষ্ণ হত।

তথ্যসূচি

১. দাস, ঝন্টু। *শৈলীতত্ত্ব ও ছোটগল্পে জীবনানন্দীয় শৈলী* । কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৩। পৃ. ১২৪।

২. নাথ, মৃণাল। *ভাষা ও সমাজ* । কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯। পৃ. ৩৭।

৩. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* । কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২। পৃ. ৩২৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯-৩৩০।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭।

৭. নাথ, মৃণাল। *ভাষা ও সমাজ* । কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯। পৃ. ৩৮-৩৯।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

৯. পূর্বোক্ত।

১০. পূর্বোক্ত।

১১. পূর্বোক্ত।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. নাথ, মৃণাল। *ভাষা ও সমাজ* । কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯। পৃ. ৪১।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ ৪১।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

১৬. পূর্বোক্ত।

১৭. পূর্বোক্ত।

১৮. পূর্বোক্ত।

১৯. পূর্বোক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবনানন্দের নির্বাচিত উপন্যাসে অন্বয়ের সংগঠন

কোনও লেখক যখন তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন অর্থাৎ কোনও কিছু লিখতে চান তখন তাঁকে অন্বয়ের দ্বারস্থ হতে হয়। এই অন্বয়ের সংগঠনের কারণেই মুখের ভাষা, কবিতার ভাষা বা গদ্যের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। বাংলা ভাষা অত্যন্ত নমনীয় (flexible) হওয়ায় এই ভাষায় বিচ্যুত ক্রম বা প্রমুখনের (foregrounding) ব্যবহার প্রচুর। আর সাহিত্য যেহেতু প্রকাশধর্মী শিল্প (expressive art) তাই লেখক তাঁর প্রবণতার জন্য বা নান্দনিক উদ্দেশ্যে নানান বিচ্যুতির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

প্রত্যেক ভাষাতেই বাক্য বিন্যাসের একটি আদর্শ ক্রম থাকে। ইংরেজি বাক্যের ক্ষেত্রে এই আদর্শ ক্রম হল কর্তা+ক্রিয়া+কর্ম বা SVO, সংস্কৃত, হিন্দি ইত্যাদি ভারতীয় ভাষার মতো বাংলা ভাষার বাক্যেরও আদর্শ ক্রমটি হল কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া বা SOV প্যাটার্ন। এই কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া বা SOV প্যাটার্নকে নানাভাবে ভাঙা সম্ভব, অর্থ যদি বিপর্যস্ত না হয় তবে সেই বিকল্প প্যাটার্নটিও গ্রহণীয়।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নোয়াম চমস্কি (১৯২৮—) তাঁর *Syntactic Structures* গ্রন্থে বাক্যের আন্বয়িক সংগঠন বিশ্লেষণের জন্য তিন ধরনের ব্যাকরণের কথা বলেছেন-

১) Finite State Grammar

২) Phrase Structure Grammar

৩) Transformation Grammar

চমস্কি প্রথমে ভেবেছিলেন পদগুলি টাইপ কেসে-র মতো আমাদের ধারণায় সাজানো আছে। এটি মাথায় রেখে তিনি Finite State Grammar-এর মডেলটি তৈরি করেন। এখানে তিনি ব্যাকরণের সহজতম গঠনের কথা বলেছেন। পুনর্গঠন তত্ত্ব বা Recursive Rule প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দভাণ্ডার দিয়ে অসংখ্য বাক্য সঞ্জনন করাকেই Finite State Grammar বলেছেন। এরপর Phrase Structure Grammar-অংশে তিনি বললেন আন্বয়িক স্তরে ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা উপাদান (constituents) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ হয়। এখানে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে একটি নতুন রূপকে দেখালেন। কিন্তু সব রকম ইংরেজি বাক্যই এই Phrase Structure Grammar সঞ্জনন করতে পারবে কিনা তা তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। তিনি বললেন অনেক ইংরেজি বাক্য আছে যা এই ব্যাকরণের মাধ্যমে 'clumsily' বলে মনে হবে। অর্থাৎ প্রচণ্ড জটিল, তাৎক্ষণিক ও গঠনটি যুক্ত গঠন বলে মনে হবে। সেই কারণেই তিনি Phrase Structure Grammar-এর তুলনায় Transformational Grammar-কে গুরুত্ব দিলেন। এবং দেখালেন Phrase Structure Grammar বা পদগুচ্ছ সংগঠন-এর তুলনায় Transformational Grammar বা সংবর্তনী ব্যাকরণ অনেক সহজ। Transformational Grammar বক্তা ও শ্রোতার স্বজ্ঞায় (Intuition) বেশি করে ধরা থাকে।

চমস্কি তাঁর *Syntactic Structures* গ্রন্থে সংবর্তনী সূত্রের ব্যাখ্যায় শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics-কে কোনও গুরুত্ব দেননি, ধ্বনিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই অন্বয়ের সংগঠনের বিশ্লেষণে এই সূত্র সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য ১৯৬৫ সালে তিনি *Aspects of the Theory of Syntax* গ্রন্থে সংবর্তনী তত্ত্বের বিবর্তিত রূপ প্রকাশ করেন যা সাধারণ ভাবে Standard Theory (ST) নামে পরিচিত। এখানে তিনি পারঙ্গমতা বোধ (Competence) এবং ভাষা ব্যবহার (Performance)—এই দুটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

এখানে বললেন মাতৃভাষা ব্যবহার করার সময় আমরা নিজের অজান্তেই ভাষার ব্যাকরণ জেনে যাই। তাই প্রত্যেকের মস্তিস্কের মধ্যে তার নিজস্ব ধারণা নিয়ে একটি করে ব্যাকরণের কাঠামো থাকে। তার সাথে থাকে শব্দকোষ (Lexicon)। ভাষা সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান নিয়ে তৈরি হয় পারঙ্গমতা বোধ বা Competence এবং যখন মুখে কথা বলা হয় তা হল ভাষা ব্যবহার বা Performance। সঞ্জননী ব্যাকরণকে তিনি কতকগুলি নিয়মের পদ্ধতি বললেন, যার মাধ্যমে আমরা অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রচুর গঠন লাভ করি। কিন্তু এই Standard Theory বা ST-তে অধিগঠন (Surface Structure) স্তরে শব্দার্থের ব্যাখ্যায় কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা দিলে চমস্কি এই সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য Extended Standard Theory (EST) নামে আরেকটি সংশোধিত মডেল প্রকাশ করেন। এখানে তিনি Standard Theory-র বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এই মডেলে তিনি D-Structure (ডি-গঠন) ও S-Structure (এস-গঠন) পরিভাষা দুটি ব্যবহার করেছেন। এই D-Structure হল Deep Structure বা অধোগঠনের একটি পরিবর্তিত ধারণা। এর মূল কাজ হল বিষয়গত (Thematic) ভূমিকা সরাসরি যুক্ত হয়ে আছে এমন বাক্যের গঠনগত (Structural) দিকগুলি দেখানো। S-Structure হল Surface Structure বা অধিগঠনের একটি পরিবর্তিত ধারণা। সংবর্তন ও কারক সূত্র-র (Case Rules) পর সঞ্জনিত হয় S-Structure। EST-তত্ত্বের সাথে তিনি Trace Theory (t) যুক্ত করেন। এই Trace Theory (t)-র মাধ্যমে তিনি প্রধানত ধ্বনিতাত্ত্বিক শূন্য উপাদানকে বোঝাতে চেয়েছেন। এরপর **১৯৮১** সালে চমস্কি তাঁর *Lectures on Government and Binding* গ্রন্থে EST-তত্ত্বের সংশোধন ও বিবর্তন করে নাম দেন Government and Binding(GB) তত্ত্ব। এখানে তিনি Move-α বা মুভ আলফা-র কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে যে সংবর্তনের মাধ্যমে আমরা D-Structure থেকে S-Structure পাই তাই হল Move-α বা আলফা স্থানান্তরণ। Government and Binding বা GB-তত্ত্বের একমাত্র সংবর্তন হল এই

Move-α। ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে তিনি ১৯৮১-র এই তত্ত্বকে আর GB Theory বলতে চাননি। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Minimalist Program* গ্রন্থের index-এ তিনি 'Government-Binding (GB) Theory' যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনই আবার তিনি 'Principles-and-parameters (P&P) model'-এর কথাও বলেছেন। অনেক সময় সঞ্জননী (Generative) ভাষাবিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে GB Theory বলা হয়, যা বিভ্রান্তিকর। তাই GB Theory এই পরিভাষাটি বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি এবং এর পরিবর্তে 'Principles and Parameters (P&P)' এই পরিভাষাটি গ্রহণ করতে চান। Projection principles বা প্রোজেকশন তত্ত্ব এই ১৯৮১-র তত্ত্বকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করেছে। এখানে তিনি দেখাচ্ছেন শব্দকোষ বা Lexicon থেকে Projection Rule বা প্রোজেকশন সূত্র এবং x-bar theory অর্থাৎ এক্স বার সূত্রের মাধ্যমে D-Structure বা ডি-গঠন পাওয়া যায়। এবং এই D-Structure বা ডি-গঠন থেকে α-movement বা আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে আমরা S-Structure বা এস-গঠন পাই। এখানে Projection principles বা প্রোজেকশন তত্ত্ব সম্পর্কে চমস্কির ধারণার কথাটি বলা প্রয়োজন। Projection principles বা প্রোজেকশন তত্ত্ব বলতে তিনি মনে করেন যে, শব্দকোষ থেকে নেওয়া উপাদানগুলির শ্রেণি-বৈশিষ্ট্য যা থাকবে তা যেন Logical Form (LF)-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শর্তগুলি পালিত না হলে বাক্য সুগঠিত হবে না। প্রকাশের স্তরে বা LF-এর স্তরে তত্ত্বগুলি অবস্থিত একথা যেন আমরা না মনে করি।

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী তাঁর *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ* গ্রন্থে একটি রূপরেখার সাহায্যে ডি-গঠন থেকে আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে কীভাবে এস-গঠন পাই ও প্রোজেকশন নীতি কীভাবে কাজ করছে তা দেখিয়েছেন। এখানে আমরা সেই রূপরেখাটির[১] সাহায্যে নিতে পারি—

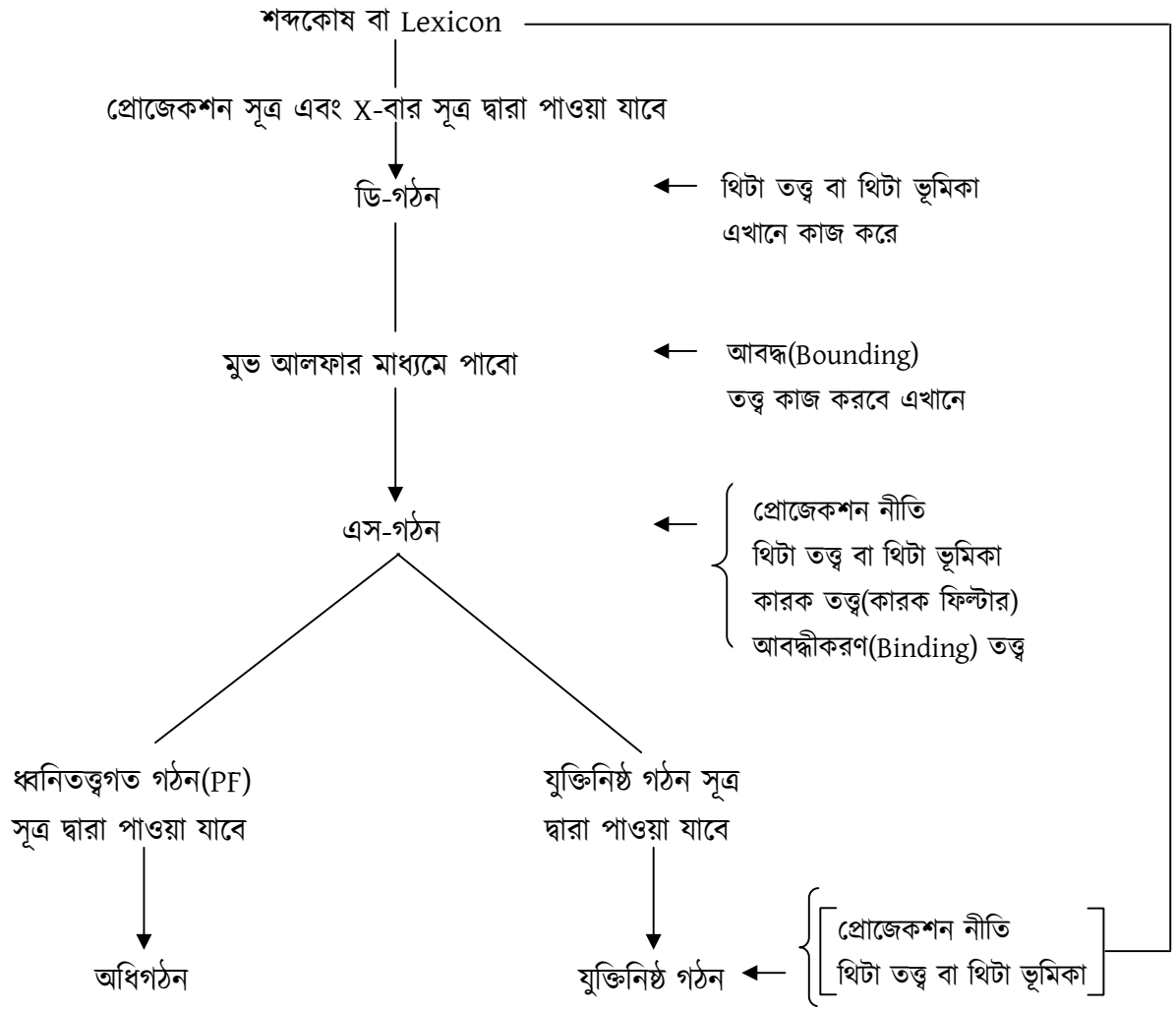

রূপরেখাটির দিকে তাকালে দেখতে পাই এখানে প্রতিটি স্তরে রয়েছে নানা উপাদান শ্রেণি। প্রথম স্তর শব্দকোষ বা Lexicon-এ নানা আভিধানিক শব্দ ও তার ব্যাকরণগত ভূমিকা লক্ষ্য করা যাবে। বিশেষ্যগুচ্ছ, ক্রিয়াগুচ্ছ বা বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি নানা উপাদান দেখা যাবে এখানে। দ্বিতীয় স্তরে x-বার সূত্রে x-কে কোনও একটি প্রধান উপাদান শ্রেণি ধরে অর্থাৎ বিশেষ্যগুচ্ছ বা ক্রিয়াগুচ্ছ ইত্যাদি উপাদান শ্রেণিকে নির্ধারণ করে বৃক্ষচিত্র (tree diagram)-এ সজ্জিত করা যায়। তৃতীয় স্তরে শব্দার্থগত দিক থেকে x-বার সূত্রে পাওয়া উপাদানগুলিকে বাক্যের আদর্শনিষ্ঠ রূপে সজ্জিত করা হয় ডি-গঠনে। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ ডি-গঠন থেকে পঞ্চম

স্তর অর্থাৎ এস-গঠনে পৌঁছানোর জন্য মাঝে α-movement বা আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে বাক্যে নানা ধরনের সংবর্তন (transformation) ঘটে। আর কোন উপাদান কোথা থেকে কোথায় স্থানান্তরিত হচ্ছে তাকে গঠনগত ভাবে আবদ্ধ করে আবদ্ধ তত্ত্ব বা Bounding Theory। ডি-গঠন থেকে এস-গঠনে পৌঁছানোর পথে আলফা মুভ দ্বারা সংঘটিত এই স্থানান্তরণ বা সংবর্তন মোটামুটি ভাবে চার রকমের হয়ে থাকে—

১) সংযোজন (Addition)

২) বিলোপন (Deletion)

৩) রূপান্তরণ বা বিস্থাপন (Substitution)

৪) বিপর্যাস (Extra-position)

এই 'আলফা' বাক্যের যে কোনও উপাদান হতে পারে, স্থানান্তরণ বা মুভমেন্টের ফলে যা নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যায়। সেই ছেড়ে যাওয়া স্থানটিকে trace theory অনুযায়ী 't' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এবং স্থানান্তরিত উপাদানটি যে স্থানে গিয়ে বসে সেটি হয় শূন্য উপাদান শ্রেণি বা empty category। যাকে 'e' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ডি-গঠন ও এস-গঠনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে এই trace। জীবনানন্দের উপন্যাস থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে আমরা স্থানান্তরণ বিষয়টিকে দেখাতে পারি—

'ভুলে গেছে সুতীর্থ।'[২] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩০]

বাক্যটির বিন্যাস আদর্শ ক্রম মেনে হয়নি। এখানে বাক্যটির বিন্যাস ক্রম হল কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা। আদর্শ ক্রম মেনে বাক্যটি হবে 'সুতীর্থ ভুলে গেছে।' যা আছে ডি-গঠনে। এখানে বাক্যটির আন্বয়িক সংগঠনটি দেখানো হল ও α-move-এর সাহায্যে সংবর্তনটিকে চিহ্নিত করা হল।

এস-গঠন: ভুলে গেছে সুতীর্থ।

ডি-গঠন:

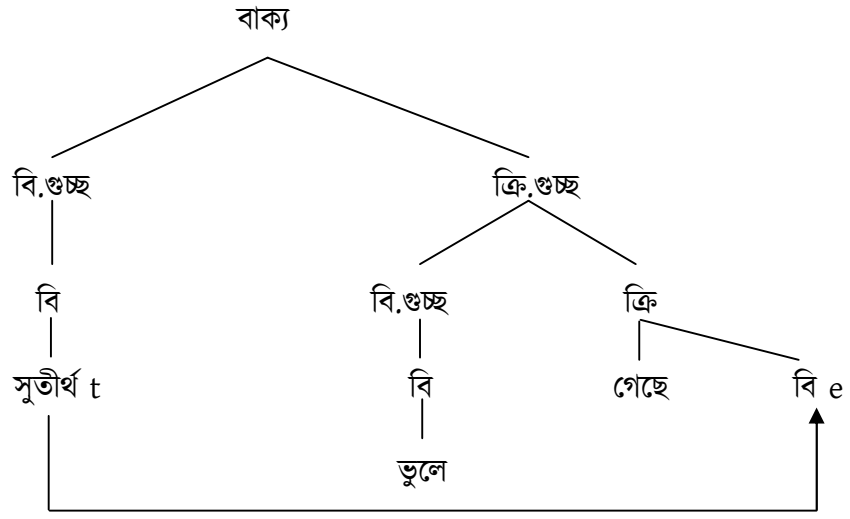

বি.গুচ্ছ স্থানান্তরণ

বৃক্ষরেখাচিত্র (tree diagram)-টিতে ‘t’ দ্বারা স্থানান্তরিত উপাদানটিকে চিহ্নিত করা হল এবং ‘e’ দ্বারা তার তার প্রকৃত অবস্থানটিকে দেখানো হল। এখানে বিশেষ্যের স্থানান্তরণ ঘটেছে। মুভ-আলফার সাহায্যে ডি-গঠন থেকে এখানে এস-গঠনে পৌঁছানোর জন্য যে সংবর্তন হল তা গঠনগতভাবে আবদ্ধতত্ত্ব দ্বারা সংযুক্ত। ‘t’ দ্বারা স্থানান্তরিত উপাদান ও ‘e’ দ্বারা শূন্য অবস্থানটিকে চিহ্নিত করায় এস-গঠনেও ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপের সাথে শব্দার্থগত রূপ বা যুক্তিনিষ্ঠ গঠন ধরা পড়ল। অর্থাৎ এস-গঠনেও থিটা ভূমিকা বা বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রইল। এই শৈলীগত সংবর্তনকে আমরা বলতে পারি রূপান্তরণ বা বিস্থাপন।

জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের আদর্শ ক্রম অর্থাৎ SOV প্যাটার্ন বা কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া এই প্যাটার্নকেই অনুসরণ করেছেন। সংবর্তিত প্যাটার্নের মধ্যে তিনি OVS প্যাটার্ন বা কর্ম+ক্রিয়া+কর্তা প্যাটার্ন ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশি। OSV প্যাটার্নেরও ব্যবহার করেছেন বেশ কিছুক্ষেত্রে। SVO প্যাটার্নের অন্বয়ও ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে কম, আর VOS ও VSO প্যাটার্নের ব্যবহার তো প্রায় নেই বললেই চলে। সংবর্তিত প্যাটার্নের মধ্যে OVS প্যাটার্নকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হল বিপর্যাসের প্রতি আকর্ষণ। এই

প্যাটার্নে কর্তার সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। এক ধরনের বিলম্ব লক্ষ্য করা যায় এই প্যাটার্নের বাক্যে। একই সাথে তৈরি হয় ঔৎসুক্যও। এই ধরনের বাক্যে কর্তাকে সরিয়ে রেখে কর্মের প্রতি ঝোঁক দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে যে কোনও সংবর্তিত প্যাটার্নের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু শৈলীগত প্রক্রিয়া তৈরি হয়ে থাকে। যেমন, OSV-এর ক্ষেত্রে সমস্ত focus থাকে কর্মের উপর। ফলে মনে হয় বাক্যটি যেন দুটি খণ্ডে বিভক্ত। যার প্রথম খণ্ডে রয়েছে কর্ম, দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে কর্তা ও ক্রিয়া। এখানে কর্তাকে ছাপিয়ে কর্মই প্রধান হয়ে ওঠে। আবার একই রকম ভাবে SVO-প্যাটার্নের ক্ষেত্রে কর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। এবং কর্তার সাথে সাথে ক্রিয়ার প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। কখনও বা ক্রিয়াই হয়ে ওঠে এই ধরনের বাক্যের মূল চালিকা শক্তি। জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে সংবর্তিত বাক্য নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তা শুধু তাঁর বক্তব্যকে সুচারু ভাবে উপস্থাপন করতেই সাহায্য করেনি, তাঁর উপন্যাসের ভাষাকে আরও চিত্তাকর্ষক করেছে। এবং উপন্যাসগুলিকে নান্দনিক মাত্রা প্রদানেও সাহায্য করেছে।

ক) SOV প্যাটার্নের সংগঠন-

'নিশীথ বিছানায় শুয়ে পড়ল।'[৩] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১২]

ডি-গঠন:

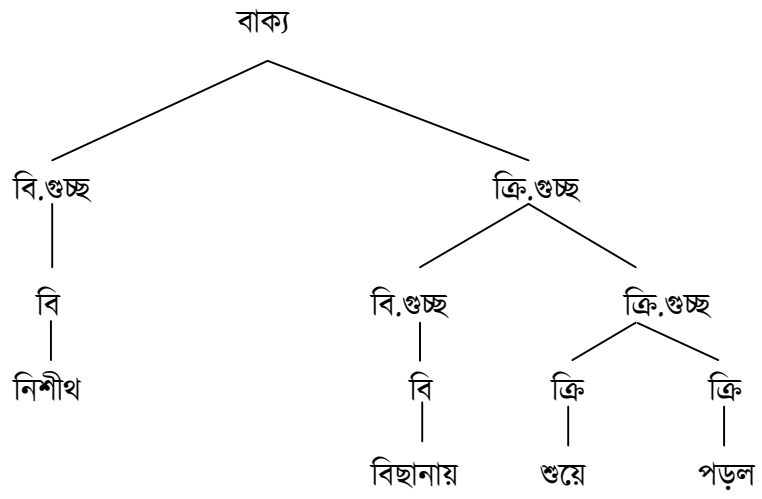

এখানে বাক্যের স্বাভাবিক ক্রম অর্থাৎ কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া অন্বয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। তার ফলে এখানে কোনও স্থানান্তরণ বা movement ঘটেনি। প্রত্যেকটি উপাদানই যথাযথ স্থানে রয়েছে। এখানে 'বিছানায়' পদটি ক্রি.গুচ্ছের অন্তর্গত বিশেষ্য। এখানে তথ্য পরিবেশনই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণে বাক্যের কোনও জটিলতা এখানে পাওয়া যায় না। এই ধরনের বাক্যে ক্রি. গুচ্ছের অন্তর্গত বিশেষ্যগুচ্ছের মধ্যে নির্দেশক, বিশেষণ ইত্যাদি অবস্থান করে। জীবনানন্দের উপন্যাসে এই ধরনের বাক্যের ব্যবহার প্রচুর। এখানে কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হল।

দৃষ্টান্ত-

১) 'নমিতা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।'[৪] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৩]

২) 'নিশীথ ড্রয়িংরুমের ফ্যানটা খুলে দিল।'[৫] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৩২]

৩) 'নিশীথ খুব আস্তে-আস্তে সিগারেট টানছিল।'[৬] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৩৩]

৪) 'অর্চনার হাতে একটা বই ছিল।'[৭] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৭৯]

৫) 'সুতীর্থ হন হন করে হাঁটতে লাগল।'[৮] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩৮]

৬) 'সুতীর্থ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল।'[৯] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৪৯]

৭) 'জয়তী টাকার মর্ম জানে।'[১০] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৪৯]

৮) 'জয়তী বইটা বন্ধ করল।'[১১] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৫০]

৯) 'জয়তী বই খুলে পাতার দিকে তাকিয়ে রইল।'[১২] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৫০]

১০) 'উৎপলা বিছানার ওপর উঠে বসল।'[১৩] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৭৯]

খ) OVS প্যাটার্নের আন্বয়িক সংগঠন-

'নীচে চলে গেল নিশীথ।'[১৪] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২১]

ডি-গঠন:

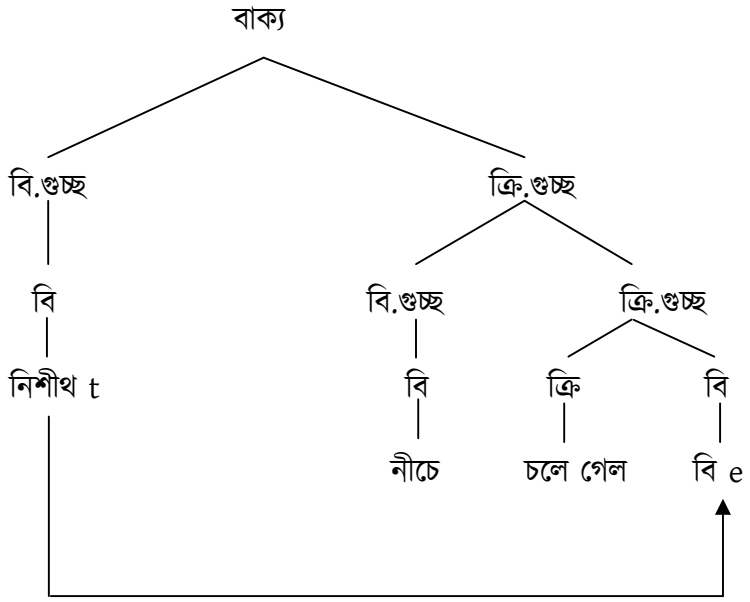

বি.গুচ্ছ স্থানান্তরণ

এখানে বাক্যের স্বাভাবিক ক্রমটি (SVO)-র সংবর্তন ঘটানো হয়েছে। বাক্যের অধোগঠন স্তরটিতে আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে তা দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে বাক্যের কর্তা 'নিশীথ' পদটির স্থানান্তরণ হয়েছে এবং তা ক্রি.গুচ্ছের অন্তর্গত হয়ে সকলের শেষে অবস্থান করছে (রেখচিত্রে e-দ্বারা চিহ্নিত)। এখানে জীবনানন্দের উপন্যাসে ব্যবহৃত আরও কিছু OVS-প্যাটার্নের বাক্য তুলে ধরা হল।

দৃষ্টান্ত-

১) 'কোথায় বিছানাটা পাতা যায় রামধন?'[১৫] [*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৩৮১]

২) 'বাংলা খুব ভাল জানে সে।'[১৬] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৩]

৩) 'টিন এগিয়ে দিল নমিতা।'[১৭] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৫]

৪) 'তেষ্টার অভাব হয়েছে আমাদের।'[১৮] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৩১]

৫) 'এক গেলাস জল খেল নিশীথ।'[১৯] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৯৮]

৬) 'অচেতন হয়ে ঘুমুচ্ছে নিশীথ।'[২০] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৫০১]

৭) 'অমলার সঙ্গে কথা বলে দেখেছে সুতীর্থ?'[২১] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩৮]

৮) ‘বড্ড বেঁচে গেছেন ভট্টচার্য্যি মশাই।’[২২] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩৯]

৮) ‘পলাকে এসব কথা কোনোদিন বলে নি মাল্যবান।’[২৩] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৭৪]

৯) ‘দোতলার বাথরুমে মাল্যবানকে চান করতে দেয় না উৎপলা।’[২৪] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৮১]

১০) ‘একটা ঘোলা নিঃশ্বাস ফেলল উৎপলা।’[২৫] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৭৪]

গ) OSV প্যাটার্নের আন্বয়িক সংগঠন-

‘বেলা দুটোর সময় সুতীর্থ জেগে উঠল।’[২৬] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩৮]

ডি-গঠন:

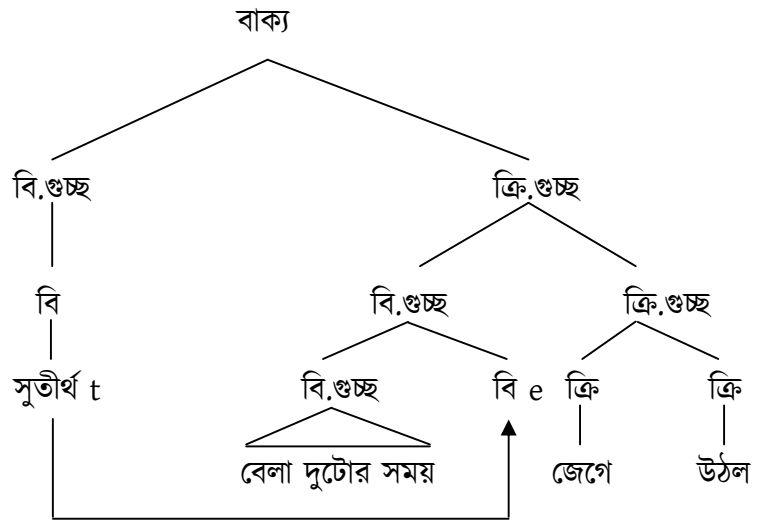

বি.গুচ্ছ স্থানান্তরণ

OSV-প্যাটার্নের এই বাক্যটির অধোগঠনের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, বাক্যটির গঠন বেশ জটিল। এই ধরনের প্যাটার্নে বাক্যে জটিলতা তৈরি করেন লেখক। এই সংবর্তনে মূলত বিপর্যাসের মাধ্যমে কর্তা ও কর্মের মধ্যে নিকট অন্বয় তৈরি হওয়ার কথা কিন্তু এখানে কর্তা ও কর্মের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এই ধরনের বাক্যের আন্বয়িক গঠনে বিশেষ্যগুচ্ছের স্থানান্তরণ হয়ে থাকে। এই ধরনের প্যাটার্ন প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই ধরনের বাক্যে সর্বনাম পদের ব্যবহারও বিশেষ লক্ষণীয়। জীবনানন্দের উপন্যাসে ব্যবহৃত এই প্যাটার্নের আরও কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

দৃষ্টান্ত-

১) 'নিস্তব্ধভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করতে লাগল সে।'[২৭] [*কারুবাসনা*, পৃ. ২৫২]

২) 'যে-দরজাটা দিয়ে ঢুকেছে সেটা খোলাই আছে, তাকিয়ে দেখল নিশীথ।'[২৮] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪০৯]

৩) 'কাল সকালবেলা কোনদিকে যাবে সে?'[২৯] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১১]

৪) 'তুমি ওপরে যাবে না জিতেন?'[৩০] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১২]

৫) 'বেশ বড়-বড় চাকরি ব্যবসা করছে তারা।'[৩১] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৩]

৬) 'কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে সে।'[৩২] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৪]

৭) 'কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভাল লাগে তার।'[৩৩] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৪]

৮) 'কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিষক্রিয়া অনেক দূর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছে ওরা।'[৩৪] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৪]

৯) 'পাইপটা জ্বালিয়ে নিল সে।'[৩৫] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬২৩]

১০) 'নিশির ডাকে বিমূঢ়ের মত কোথাও এগিয়ে যাচ্ছিল সে।'[৩৬] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৬১]

ঘ) SVO প্যাটার্নের আন্বয়িক সংগঠন-

বাংলা ভাষায় এই ধরনের বাক্য বেশি দেখা যায় না। বাংলা ভাষার কাঠামোর জন্য এই প্যাটার্নটি হয়ত খুব একটা উপযুক্ত নয়। যে কারণে এই ধরনের বাক্যের ব্যবহার খুব সীমিত। এই ধরনের বাক্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যৌগিক ক্রিয়া থাকে। এই ধরনের বাক্য গড়ে ওঠে অনেক ক্ষেত্রেই স্থিতি ক্রিয়া (existential verb)-র উপর নির্ভর করে। এই স্থিতি ক্রিয়ার বেশি ব্যবহার ভাষায় আড়ষ্টতা আনে। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও তা দেখা গেছে কখনও কখনও। একই সাথে তিনি এই প্যাটার্নের বেশ কিছু সার্থক প্রয়োগও করেছেন। নীচে একটি SVO-প্যাটার্নের বাক্যের অধোগঠনটি দেখানো হল।

'মাল্যবান বসে রইল কনকনে ভিজে শীতে কেমন ন্যাতাজোবরার মত।'[৩৭] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৭৯]

ডি-গঠন:

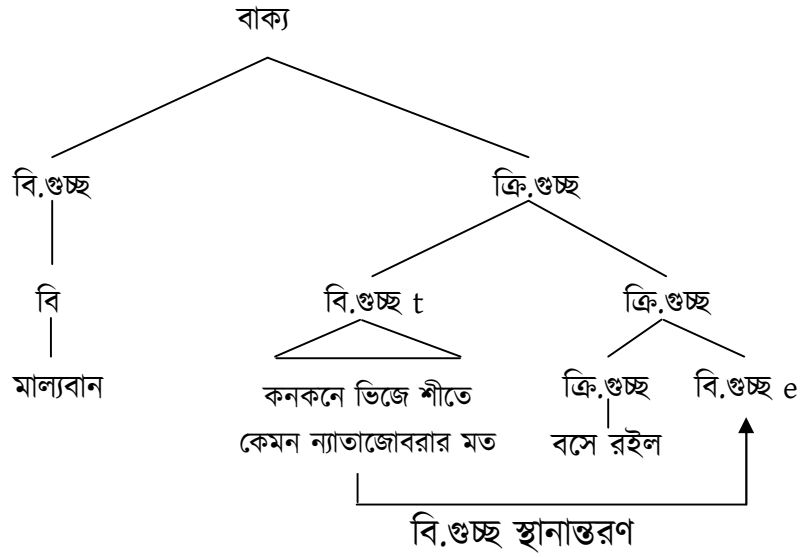

এখানে বিশেষ্যগুচ্ছের স্থানান্তরণের মাধ্যমে আদর্শ ক্রমটির সংবর্তন ঘটিয়ে SVO-প্যাটার্নের বাক্য তৈরি করা হয়েছে। জীবনানন্দের উপন্যাসে এই ধরনের বাক্য খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র *জলপাইহাটি* উপন্যাসেই এই ধরনের বাক্য কিছু বেশি দেখা যায়। এখানে এই ধরনের বাক্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

দৃষ্টান্ত-

১) 'নিশীথ উঠে মশারি গুটিয়ে বিছানা ঝেড়ে সাজিয়ে এক-আধ মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল খাটের কাছে।'[৩৮] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৩]

২) 'আমি উঠি নমিতা দেবী।'[৩৯] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২৮]

৩) 'নিশীথ জল শেষ করে গেলাসের বরফের তলানির দিকে তাকিয়ে দেখল।'[৪০] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৩২]

৪) 'নিশীথ মাথা নেড়ে বললে, ভুল বলেছে।'[৪১] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৪১]

৫) 'সুমনাকে দেখবার জন্যে রইল ডাক্তার মজুমদার আর তার কম্পাউণ্ডার জ্যোৎস্না।'[৪২] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৪৩]

৬) 'নরেনরা যেত একসময়।'[৪৩] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৫৩]

৭) 'আমি জানি কলেজের খুব মোটা ফাণ্ড আছে।'[৪৪] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৬৬]

ঙ) VOS/VSO প্যাটার্নের আন্বয়িক সংগঠন-

VOS বা VSO-এই প্যাটার্নের বাক্য বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ক্রিয়া দিয়ে যখন বাক্যের সূচনা হয় তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেখানে কর্তার বিলোপন ঘটেছে। কখনও বা দুটি বাক্য সংযোজিত হয়ে একটি বাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনানন্দের উপন্যাসে এই প্যাটার্নের বাক্য প্রায় নেই বললেই চলে, ক্রিয়া দিয়ে শুরু এরকম বাক্য পাওয়া যায় কিছু। এখানে সেই ধরনের বাক্যেরই অধোগঠন রূপটি তুলে ধরা হল।

'দেখলাম মুখের ভেতর কোন ভাব পরিবর্তন নেই।'[৪৫] [*কারুবাসনা*, পৃ. ২৫৩]

ডি-গঠন:

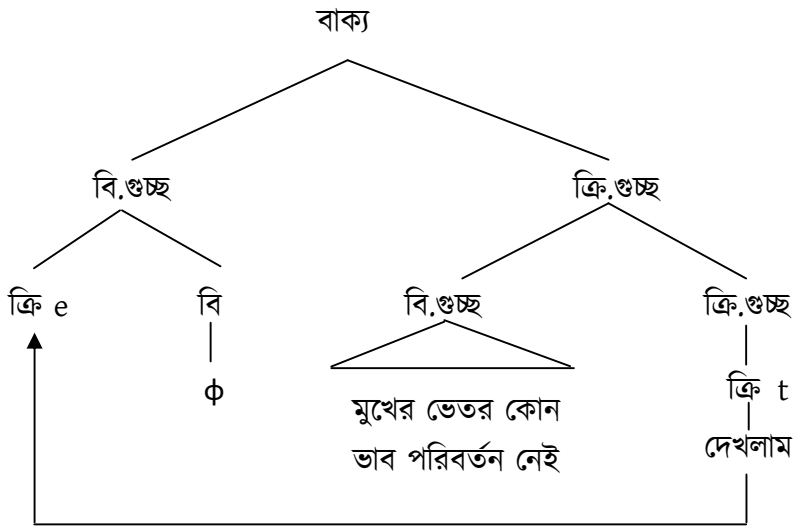

ক্রি.গুচ্ছ স্থানান্তরণ

এখানে 'দেখলাম' ক্রিয়াপদটি সংবর্তনের ফলে বাক্যের প্রথমে অবস্থান করছে। বাক্যে কর্তা-র বিলোপন ঘটেছে। একই সাথে যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য করে এই বক্তব্যটি বলা হচ্ছে তার কথাও অনুপস্থিত। কথা-বার্তার সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করি না। যদিও তার ফলে বাক্যের অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। এইরকম ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি পদ দিয়েও বাক্য তৈরি হতে পারে। জীবনানন্দের উপন্যাসে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ দিয়ে শুরু এরকম কিছু বাক্যের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হল।

দৃষ্টান্ত-

১) 'ভাবতে গিয়ে জলের তেষ্টা অনেকটা কমে গেছল নিশীথের।'[৪৬] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৬]

২) 'চলুন আপনাকে সেই বইটা দেব।'[৪৭] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৩৭]

৩) 'দেখা যাক, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আরও সাতশ টাকা তুলে নিয়েছি।'[৪৮] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪৪০]

৪) 'বলতে বলতে মণিকা ওপরে চলে গেলেন।'[৪৯] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬১৯]

৫) 'যাচ্ছি, কিন্তু রাত তো ফুরিয়ে গিয়েছিল প্রায়।'[৫০] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৭৯]

চ) কর্তাহীন বাক্যের আন্বয়িক সংগঠন-

১) 'ঘুমিয়ে পড়ল বেলা সাতটায়।'[৫১] [*সুতীর্থ*, পৃ. ৬৩৮]

ডি-গঠন:

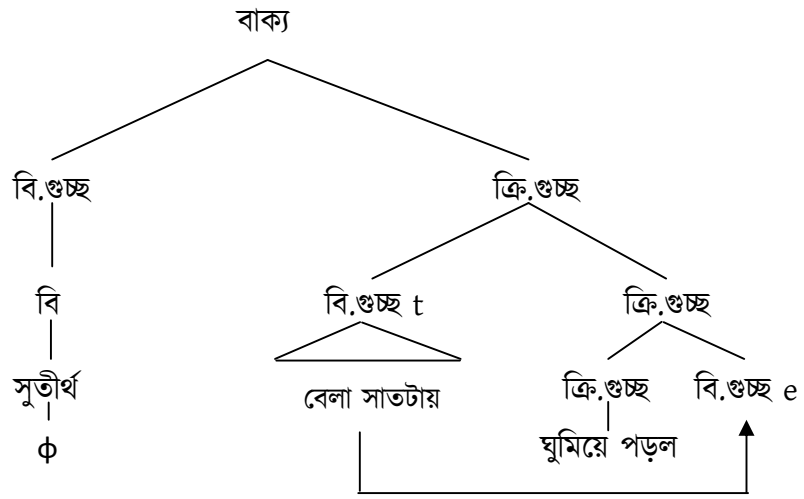

বি.গুচ্ছ স্থানান্তরণ

বাক্যটিতে কর্তা 'সুতীর্থ' অনুপস্থিত। বাক্যটির অধোগঠন দেখলেই তা বোঝা যায়। বাক্যটির কর্তা যে সুতীর্থই তা আগের বাক্যটি পড়লেই বোঝা যায়। একই বিশেষ্যপদ বারবার ব্যবহার করলে পুনরাবৃত্তির সৃষ্টি হয়, এই পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কথা বলা বা লেখার সময় সর্বনামীভবনের সাহায্য নেওয়া হয়। তার ফলে বিশেষ্যপদটিকে বারবার ব্যবহার না করে তার স্থানে সর্বনামপদ ব্যবহার করা হয়। এখানে সর্বনামের ব্যবহারও করা হয়নি। কর্তারও

বিলোপন ঘটেছে। তার ফলে বাক্যটির মধ্যে নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছ। অবশ্য তা অর্থপ্রকাশে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।

২) 'মশারি টানিয়ে শুয়ে পড়ল।'[৫২] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪২১]

ডি-গঠন:

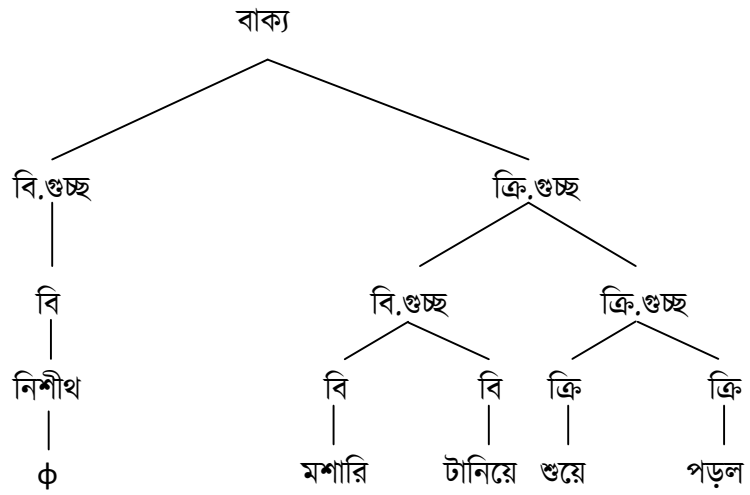

এখানে বাক্যের কোনরূপ সংবর্তন হচ্ছে না, কেবলমাত্র বাক্যের কর্তার বিলোপন ঘটছে। এক্ষেত্রেও বিশেষ্যপদটির সর্বনামীভবন না ঘটিয়ে তাকে মুছে ফেলা হয়েছে বাক্য থেকে। যে কারণে আগের বাক্যটির সাপেক্ষে এই বাক্যটিকে না পড়লে বাক্যের কর্তাকে তা বোঝা যায় না। এখানে আসলে জীবনানন্দ বারবার সর্বনাম পড়ার একঘেয়ে অবস্থা থেকে পাঠককে মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

ছ) ক্রিয়াহীন বাক্যের আন্বয়িক সংগঠন-

১) 'তোমার বিছানার পাশেই সুইচ।'[৫৩] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১২]

এই বাক্যটিতে কোনও ক্রিয়াপদ নেই। বাংলা ভাষায় অনেক সময়ই অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় না। এই বাক্যটিতেও তা-ই হয়েছে। ক্রিয়াপদ অনুপস্থিত থাকলেও এক্ষেত্রে বাক্যের অর্থপ্রকাশে কোনও সমস্যা হয় না। এখানে বাক্যটির অধোগঠনের রূপটি দেখানো হল।

ডি-গঠন:

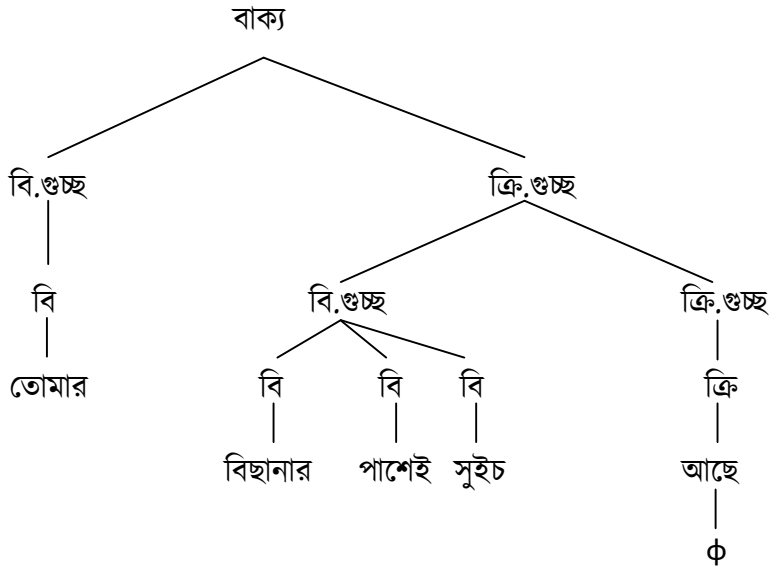

জীবনানন্দের উপন্যাসে ক্রিয়াবিহীন বাক্য খুব বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে ক্রিয়াবিহীন বাক্যের আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

২) 'খুব মৃদু চটি জুতোর শব্দ।'[৫৪] [*কারুবাসনা*, পৃ. ২৩২]

৩) 'জিতেন দাশগুপ্ত কলকাতায়?'[৫৫] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৩]

৪) 'সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন—জীবনের এই আর-এক রূপ।'[৫৬] [*কারুবাসনা*, পৃ. ২১৩]

৫) 'চৌবাচ্চায় কলকাতার পুকুর।'[৫৭] [*মাল্যবান*, পৃ. ৭৮৪]

জ) বিগর্ভিত বাক্যের আন্বয়িক সংগঠন-

'বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়েই পাবে; এ কামরার সবচেয়ে চড়া আলো জ্বলে উঠবে; দিনের মতন দেখাবে ঘরটাকে।'[৫৮] [*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৩]

এই বাক্যটিতে তিনটি আলাদা আলাদা বাক্য আছে যাদের কে সংযোজক চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংযোজিত বাক্য আসলে মূল বাক্যটিকেই আরও বিশদে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলিকে অধোগঠনে 'বাক্য', 'বাক্য ১', 'বাক্য ২' এভাবে চিহ্নিত করা হল।

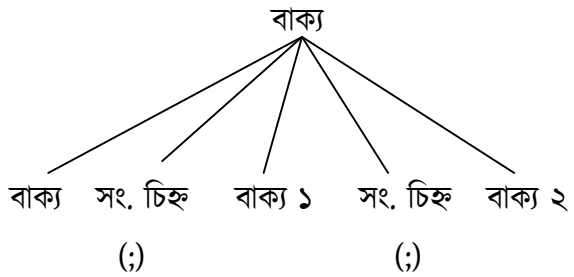
বাক্য
বাক্য
সং. চিহ্ন
বাক্য ১
সং. চিহ্ন
বাক্য ২
(;)
(;)

ডি-গঠন:

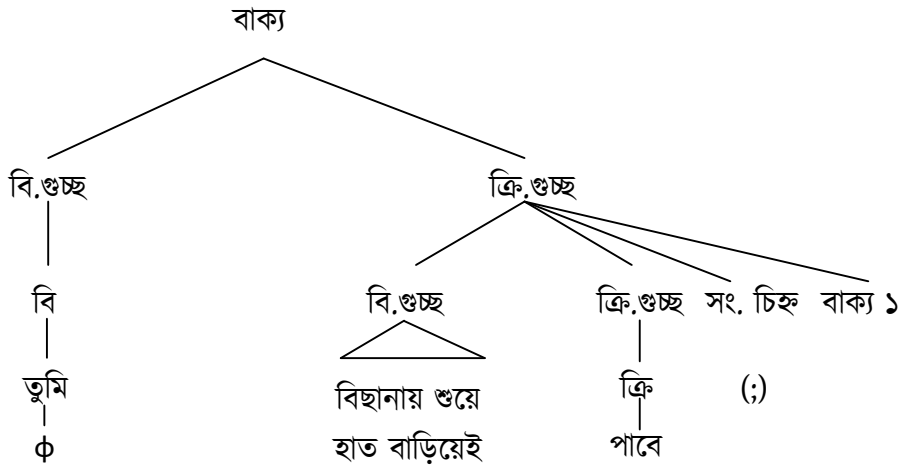
বাক্য
বি.গুচ্ছ
ক্রি.গুচ্ছ
বি
বি.গুচ্ছ
ক্রি.গুচ্ছ
সং. চিহ্ন
বাক্য ১
তুমি
বিছানায় শুয়ে
হাত বাড়িয়েই
ক্রি
(;)
পাবে
ϕ

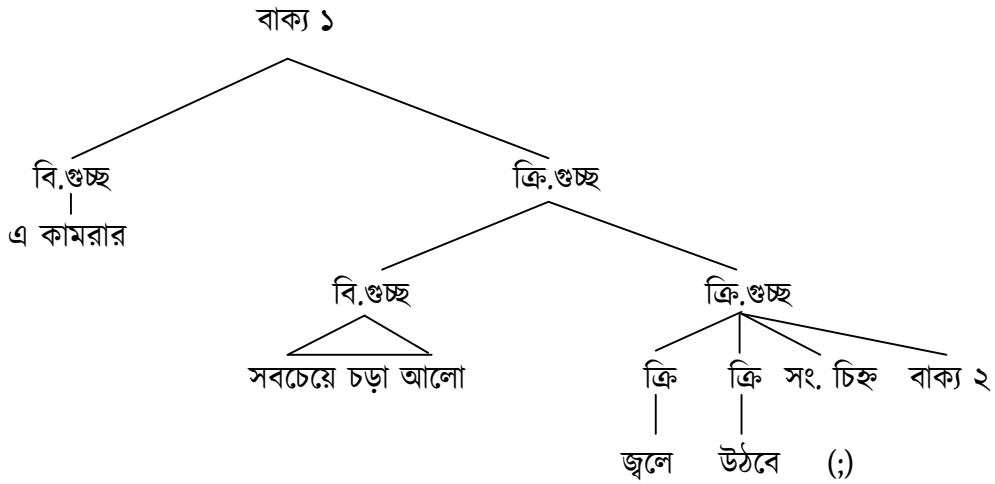
বাক্য ১
বি.গুচ্ছ
ক্রি.গুচ্ছ
এ কামরার
বি.গুচ্ছ
ক্রি.গুচ্ছ
সবচেয়ে চড়া আলো
ক্রি
ক্রি
সং. চিহ্ন
বাক্য ২
জ্বলে
উঠবে
(;)

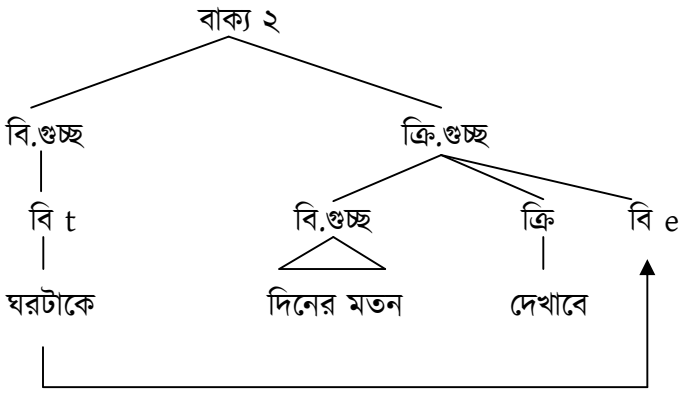

বি.গুচ্ছ স্থানান্তরণ

জীবনানন্দের উপন্যাসে প্রাপ্ত কিছু বাক্য বিগর্ভনের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হল-

১) 'দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ; কল্যাণী সেলাই করছিল, আমি বই ঝাড়ছিলাম, মুছছিলাম, পাতা উল্টাচ্ছিলাম—কিন্তু দু আনা পয়সার সম্বল আজ আমার কাছে নেই।'[৫৯]

[*কারুবাসনা*, পৃ. ২১৩]

২) 'হাঁস-মুরগি খাঁচায় ঘুমিয়ে আছে—আজ বোধহয় গোটা কয়েক বুড়ো মুরগি কাটা হয়েছে শুধু—কিংবা কে জানে একটাও কাটে নি, সেলুনে তো কোনো লোক দেখিনি আজ; তাকিয়ে দেখলাম এদের ঘুম নিরিবিলি নয়, সবাই ঘুমোচ্ছেও না—গলাগলি করে পড়ে আছে-প্রতি মুহূর্তে অন্ধকারও প্রত্যাশা করছে-এদের সঙ্গে যারা এরকম ব্যবহার করছে একদিন তাদেরও এই খাঁচায় ফিরে আসতে হবে নাকি?'[৬০]

[*প্রেতিনীর রূপকথা*, পৃ. ৩৮৪]

৪) 'কলেজের কাজটাকে মজুরির কথা বাদ দিয়ে, এমনি কাজ বা রুচি-রচনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোনোদিনই ভাল লাগেনি তার : সঙ্গে-সঙ্গে লাইব্রেরিতে নতুন কিছু-কিছু বই, প্রকৃতিতে এসে পড়ত রৌদ্রের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, আকাশে হরিয়াল, ফিঙে, বক, বড়-বড় সুন্দর ওয়াক পাখি, কলেজের ময়দান পেরিয়ে খানিকটা দূরে গেঁয়ো রাস্তা ঘেঁষে ঢি ঢি তেপান্তর, ঝিল, কানসোনা মধুকূপী পরথুপি ঘাস, শরের বন, শনের হোগলার ক্ষেত, অপিরিমেয় কাশ, হঠাৎ এক-আধটি নিখুঁত মুখসৌষ্ঠব, স্ত্রীলোকেরই, আরো দূরে বুনো হাঁসের জলা মাঠ, স্নাইপ, সকালের উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা তখন ভাল লাগত নিশীথের।'[৬১]

[*জলপাইহাটি*, পৃ. ৪১৪]

তথ্যসূচি

১) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার। *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

৩) পূর্বোক্ত।

৪) পূর্বোক্ত।

৫) পূর্বোক্ত।

৬) পূর্বোক্ত।

৭) পূর্বোক্ত।

৮) পূর্বোক্ত।

৯) পূর্বোক্ত।

১০) পূর্বোক্ত।

১১) পূর্বোক্ত।

১২) পূর্বোক্ত।

১৩) পূর্বোক্ত।

১৪) পূর্বোক্ত।

১৫) পূর্বোক্ত।

১৬) পূর্বোক্ত।

১৭) পূর্বোক্ত।

১৮) পূর্বোক্ত।

১৯) পূর্বোক্ত।

২০) পূর্বোক্ত।

২১) পূর্বোক্ত।

২২) পূর্বোক্ত।

২৩) পূর্বোক্ত।

২৪) পূর্বোক্ত।

২৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

২৬) পূর্বোক্ত।

২৭) পূর্বোক্ত।

২৮) পূর্বোক্ত।

২৯) পূর্বোক্ত।

৩০) পূর্বোক্ত।

৩১) পূর্বোক্ত।

৩২) পূর্বোক্ত।

৩৩) পূর্বোক্ত।

৩৪) পূর্বোক্ত।

৩৫) পূর্বোক্ত।

৩৬) পূর্বোক্ত।

৩৭) পূর্বোক্ত।

৩৮) পূর্বোক্ত।

৩৯) পূর্বোক্ত।

৪০) পূর্বোক্ত।

৪১) পূর্বোক্ত।

৪২) পূর্বোক্ত।

৪৩) পূর্বোক্ত।

৪৪) পূর্বোক্ত।

৪৫) পূর্বোক্ত।

৪৬) পূর্বোক্ত।

৪৭) পূর্বোক্ত।

৪৮) পূর্বোক্ত।

৪৯) পূর্বোক্ত।

৫০) পূর্বোক্ত।

৫১) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

৫২) পূর্বোক্ত।

৫৩) পূর্বোক্ত।

৫৪) পূর্বোক্ত।

৫৫) পূর্বোক্ত।

৫৬) পূর্বোক্ত।

৫৭) পূর্বোক্ত।

৫৮) পূর্বোক্ত।

৫৯) পূর্বোক্ত।

৬০) পূর্বোক্ত।

৬১) পূর্বোক্ত।

উপসংহার

কোনও এক বিষয়ের খ্যাতিই কখনও কখনও অন্য বিষয়ে প্রতিভার প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এই কথা একেবারে মিথ্যে নয়। জীবৎকাল থেকেই কবি হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। আর এই প্রতিষ্ঠা-ই হয়ত তাঁর ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের আগে ও পরে বাংলা সাহিত্যে এই রকম ঘটনা অনেকই ঘটেছে। সেদিক থেকে তিনি একমাত্র নন। অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তিই যেমন তাঁর প্রতিভাকে সব দিক দিয়ে মেলে ধরতে পারেন না, তেমনই অনেক বহুমুখী প্রতিভারও সব দিকের মূল্যায়ন মানুষ সব সময় সঠিক ভাবে করতে পারে না। কথা সাহিত্যিক জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্যি। যে কারণে বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি স্বতন্ত্র এক স্থানের দাবিদার হলেও তাঁর সেই স্থান আজও জোটেনি। যে কারণে এখনও বেশির ভাগ আলোচনায় তাঁকে কেবলমাত্র কবি হিসেবেই দেখা হয়। তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা আজও অনাবিষ্কৃত।

জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় সেগুলি ঘটনাবহুল নয়। জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রকাশ সেখানে নেই। সেখানে সমাজের বিশেষ কোনও সমস্যাকেও তুলে আনা হয়নি। সেখানে নায়কের বীরত্বের কথা নেই। নায়ক-নায়িকার প্রেমের মনোরম বহিঃপ্রকাশ নেই। এমনকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা কোনও আন্দোলনকেও উপন্যাসের ভর কেন্দ্রে রাখা হয়নি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা তবে কি সামাজিক জীব নয়? তারা সামাজিক। আমাদের এই সমাজেই বাস করে তারা। তারাও আর সকলের মতো জীবনের সমস্যা থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু তার নাটকীয় প্রকাশ নেই উপন্যাসের মধ্যে। জীবনানন্দ উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই এই নাটকীয়তাকে বর্জন করেছেন। সাময়িক উত্তেজনাকে তাঁর উপন্যাসে কখনোই

উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়নি। যে কারণে তাঁর উপন্যাসে সমসাময়িক ঘটনারও একটি নির্মোহ উপস্থাপন আমরা দেখতে পাই। ঘটনাটি লেখকের চোখের সামনে ঘটলেও লেখক যেন তার দ্বারা পাঠকের মনকে প্রভাবিত করতে চান না। উল্টে পাঠককে সুযোগ করে দেন নির্মোহ দৃষ্টিতে বিষয়টি বিচার করার জন্য। যা আমাদের বাঙালি মানসিকতায় একটু অস্বাভাবিক ঠেকে।

জীবনানন্দের উপন্যাসে আলোচ্য বিষয় 'মানুষ'। উপন্যাসগুলির থিমে তাই চমক নেই। কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করেই তারা আবর্তিত। লেখকের ব্যক্তি হৃদয়ের অভিজ্ঞতাই সেখানে সৃষ্টির মূলধন। একই সাথে তিনি সমাজ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। তাই তার উপন্যাসের মধ্যে বারবার সমাজের অবক্ষয়ের দিকটিও ফুটে উঠেছে। তার উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে যেমন সমাজ থেকে পৃথক করা সম্ভব নয় তেমনই প্রকৃতি থেকেও তাদের আলাদা করা যায় না। প্রকৃতি তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতি যে চরিত্রগুলিকে আশ্রয় দেয় বা প্রকৃতির কোলে চরিত্রগুলি জীবনে বাঁচার রসদ খুঁজে পায় এরকম না। প্রকৃতি যেন প্রেক্ষাপট হয়ে ওঠে চরিত্রগুলির প্রকাশে। চরিত্রগুলিকে সম্যক ভাবে জানতে হলে প্রকৃতি হল তার রেফারেন্স। জীবনানন্দ চরিত্রগুলির বর্ণনা দেওয়ার সময়ও তাই তাদের বাহ্যিক বর্ণনা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি, বরং বিশেষ কোনও মুহূর্তে সেই চরিত্র কিরূপ হয়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের চরিত্রের অন্তর্গত দিকের বর্ণনায় বারবার উঠে এসেছে প্রকৃতি ও জীবজগতের সাথে তাদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। চরিত্রের মনোজগতের নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়া দেখাতে গিয়েও তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। উপমা ও মেটাফরের ব্যবহার কখনও কখনও তাঁর উপন্যাসে কবিতার স্বাদও এনে দিয়েছে। বাচন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তাঁর উপন্যাসে বর্ণনা অংশের অনেকখানি জুড়ে আছে কাব্যিক বর্ণনা। যেখানে তিনি এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন।

জীবনানন্দ যে সমাজ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন তা তাঁর সমাজভাষা প্রয়োগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়। জীবনানন্দের উপন্যাসে সাধারণ ভাবে রেজিস্টারের প্রয়োগ খুব বেশি দেখা যায় না। আমরা শুরুতে গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্বের কথা বললেও তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের ভাষায় এই বিভেদ খুব বেশি দেখা যায় না। আরও স্পষ্ট করে বলে একজন গ্রামে বসবাসকারী মানুষ (যার অতীতে শহরবাসের অভিজ্ঞতা আছে) যখন শহরে যায় তখন তার মুখের ভাষায় তেমন কিছু পরিবর্তন আসে না। একই রকম ভাবে একটি চরিত্র যে শহর থেকে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসছে তার সাথে গ্রামের অন্য মানুষের মুখের ভাষায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। এর একটি কারণ অবশ্য চরিত্রগুলি সাধারণ গ্রাম্য চরিত্র নয়। তারা সেই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে যাদের কাছে বিদ্যা থাকলেও হাতে অর্থের প্রাচুর্য নেই। জীবনানন্দ *সুতীর্থ* আর *জলপাইহাটি* উপন্যাসে এই শ্রেণিগত বৈষম্যের বিষয়টি দারুণভাবে দেখিয়েছেন। বিরূপাক্ষ, জিতেন দাশগুপ্ত এরা এই ব্যবসায়ী শ্রেণির লোক যাদের হাতে রয়েছে অর্থের ভাণ্ডার। অপরদিকে নিশীথের মতো মানুষ সামান্য কিছু টাকার জন্য যাকে চুরির কথা মনে আনতে হয়। সে তার সামাজিক অবস্থান ভুলে যায় সহজেই। হারীত স্বপ্ন দেখে সমাজ বদলের কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দলের ওপরেই তার বিশ্বাস নেই। সে নিশীথের মতের সাথেও একমত হতে পারে না। যে কারণে বাবার সাথে তার দূরত্ব তৈরি হয়। জীবনানন্দের উপন্যাসের প্রায় সব চরিত্রের মধ্যেই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। তারা কেউ একে অপরের গলা জড়িয়ে শোক প্রকাশের কথা ভাবতেও পারে না। অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে অবলীলায় নিশীথ তাই শহরে চলে যেতে পারে। যদিও সে অর্থের জন্য যাত্রা করে তবুও তার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি তেমন টান অনুভব করা যায় না। একই রকম ভাবে হারীতও অসুস্থ মাকে নিয়ে তেমন চিন্তিত নয় সে অসুস্থ মাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও তাই বলে অর্চিতার কাছে। অর্চিতার সাথে মহিমের নিবিড়তার কোনও নিদর্শন দেখা যায় না। একই রকম ভাবে নমিতা ও জিতেন, তারা একে অপরের

জীবনে অবিচ্ছেদ্য নয়। তাদের আলাদা জীবন আছে যেখানে অন্য জনের উপস্থিতি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাকি উপন্যাস গুলির ক্ষেত্রেও এই বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

আবার উপন্যাসের ভাষার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উপন্যাসগুলির বেশিরভাগ চরিত্রই শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হওয়াই প্রচুর বিদেশি শব্দের ব্যবহার যেমন চোখে পড়ে তেমনই ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষার নানান বইয়ের প্রসঙ্গও উঠে আসে। উপমা ব্যবহারে কখনও বিদেশি চিত্রশিল্পীর চিত্রের প্রসঙ্গ আসে, কখনও বা বিদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা আসে। একই সাথে তিনি বাংলার একেবারে নিজস্ব গ্রামীণ পরিবেশকে মিলিয়ে দেন। ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিদেশি শব্দ আর দেশি শব্দের এমন মেলবন্ধন অন্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে এভাবে চোখে পড়ে না।

তাঁর উপন্যাসে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষ যে একেবারে নেই তা নয়। তাদের ভাষার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে *সুতীর্থ* উপন্যাসে সুতীর্থের সাথে শোভানের কথোপকথন প্রসঙ্গটি মনে করতে পারি বা মধুমঙ্গলের সাথে বিপিনের কথোপকথন অংশটি।

নাটকীয়তা জীবনানন্দ সর্বত্র বর্জন করার চেষ্টা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। যে কারণে স্বাধীনতার সমসাময়িক সময়ে লেখা হলেও বা উপন্যাসে স্বাধীনতা লাভের প্রসঙ্গ থাকলেও তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের মুখে স্বাধীনতা নিয়ে আবেগে গা ভাসান বা কোনও উত্তেজিত মুহূর্ত সৃষ্টি হতে দেখি না। একই ভাবে তাঁর উপন্যাসে এমন অনেক মুহূর্ত আছে যেখানে লেখকের নাটকীয়তা সৃষ্টির লোভ সংবরণ করাই মুশকিল। সে অসুস্থ স্ত্রীকে ছেড়ে নিশীথের শহর যাত্রা হোক বা নমিতার সাথে নিশীথের সময় কাটানো হোক, জীবনানন্দ কিন্তু এরকম অজস্র নাটকীয়

মুহূর্ত সৃষ্টির প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করেছেন। এমনকি তিনি তথাকথিত 'বিদায় অংশ' নির্মাণেরও প্রয়োজন মনে করেননি অনেক সময়।

তিনি যেমন প্রথাগত অনেক কিছুই তাঁর উপন্যাসে বর্জন করেন তেমন অনেক কিছু অভিনব সংযোজনও করেছেন। যার মধ্যে অন্যতম শব্দ নির্বাচন। তিনি যেমন প্রাসঙ্গিক শব্দের ব্যবহার করেছেন তেমনই প্রচুর নতুন শব্দের সৃষ্টিও করেছেন, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে সাংকেতিক দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন যা কখনও কখনও সাধারণ পাঠকের অনুধাবন করতে কষ্ট হয়েছে। একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে তৈরি করেছেন দীর্ঘ বাক্য যা প্রেক্ষাপটের বর্ণনায় detailing-এর কাজে সাহায্য করেছে। শুধু অসমাপিকা ক্রিয়ার নানারূপ ব্যবহারই নয় জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসে বাংলা ভাষাকে নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন যা আমরা অন্বয়ের আলোচনায় দেখিয়েছি। পরিশেষে একথা বলতেই হয় আমাদের এই গবেষণা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। জীবনানন্দের উপন্যাসের বহুকৌণিক ও বহুমাত্রিক দিকের খুব সামান্যই হয়ত আমরা এই গবেষণায় ছুঁতে পেরেছি। জীবনানন্দের উপন্যাসে উপমা ও মেটাফর নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়াই আমরা সে বিষয়ে তেমন কিছু আলোচনা করিনি। জীবনানন্দের সমস্ত উপন্যাস নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার ইচ্ছা আছে আমাদের। আমাদের এই গবেষণা যদি ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ সম্পর্কে অন্যান্য গবেষকদের আগ্রহী করে বা সাধারণ পাঠককে জীবনানন্দ পড়তে উৎসাহ দেয় বা তাদের জীবনানন্দ পাঠে কোনরূপ সহায়তা করতে পারে তাহলেই আমাদের গবেষণা সার্থক।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

দাশ, জীবনানন্দ। *মাল্যবান* । কোলকাতা: নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৪।

দাশ, জীবনানন্দ। *সুতীর্থ*। কলিকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

রায়, দেবেশ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ সমগ্র* (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫।

রায়, দেবেশ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫।

রায়, দেবেশ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ সমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড)। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

রায়, দেবেশ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ সমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড)। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

রায়, দেবেশ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ সমগ্র* (ষষ্ঠ খণ্ড)। কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬।

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

আজাদ, হুমায়ুন। *বাক্যতত্ত্ব* । ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১০।

খান, ড. মণিলাল। *বাংলা চলিত গদ্য* । কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৬০।

গুহ, ভূমেন্দ্র (সম্পা.)। *জন্ম শতবর্ষে জীবনানন্দ*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩।

ঘোষ, শঙ্খ। *ছন্দের বারান্দা* । কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১।

ঘোষ, শঙ্খ (সম্পা.)। *এই সময় ও জীবনানন্দ* । কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১।

চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার। *বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার। *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার ও চক্রবর্তী, ড. নীলিমা। *ভাষাবিজ্ঞান* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

চক্রবর্তী, নীলিমা। *বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব* । কলকাতা: ইন্দাস, ২০০৬।

চাকলাদার, মনোজ। *আধুনিক ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশ* । কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১৬।

চৌধুরী, প্রণব (সম্পা)। *জীবনানন্দ নিয়ে প্রবন্ধ* । ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।

জলদাস, হরিশংকর। *জীবনানন্দ ও তাঁর কাল* । ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০১৪।

দাশ, জীবনানন্দ। *কবিতার কথা* । কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

দাশ, শিশিরকুমার। *গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব* । কলকাতা: দে'জ, ২০১৬।

দাশ, শিশিরকুমার। *ভাষা জিজ্ঞাসা* । কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯২।

দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন। *জীবনানন্দ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

দাস, অমিতাভ। *আখ্যান তত্ত্ব* । কোলকাতা: ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, ২০১০।

দাস, ঝন্টু। *শৈলীতত্ত্ব ও ছোটগল্পে জীবনানন্দীয় শৈলী* । কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (১ম খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ(সম্পা.)। *জীবনানন্দ রচনাবলী* (২য় খণ্ড)। ঢাকা: গতিধারা, ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *আমার জীবনানন্দ* । কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮।

বসু, ড. অরুণকুমার ও বসু, ড. অপূর্বকুমার (সম্পা.)। *নবসংস্করণে বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা* । কোলকাতা: সমটত প্রকাশন, ২০০৪।

মজুমদার, ড. অভিজিৎ। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭।

মিত্র, গৌতম। *পাণ্ডুলিপি থেকে ডায়েরি* (১ম খণ্ড)। কলকাতা: ঋত প্রকাশন, ২০১৯।

মিত্র, প্রদ্যুম্ন। *জীবনানন্দের চেতনাজগৎ* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০।

রায়, গৌতম (সম্পা.)। *শামসুর রাহমান গদ্য সংগ্রহ* । কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০০।

রুদ্র, সুব্রত (সম্পা.)। *জীবনানন্দ: জীবন আর সৃষ্টি* । কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, ১৯৬০।

লাহিড়ী, রণবীর। *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান* । কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১১।

শাহাদুজ্জামান। *একজন কমলালেবু* । ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭।

সরকার, পবিত্র। *গদ্যরীতি পদ্যরীতি* । কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮৫।

সেন, নবেন্দু। *বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্* । কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯০।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড)। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

সেনমজুমদার, ড. জহর। *জীবনানন্দ ও পদচিহ্নময় অন্ধকার* । কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, ১৯৯৩।

ইংরেজি

Chomsky, Noam. *Aspects of the Theory of Syntax.* Cambridge: Mass. MIT press, 1965.

Chomsky, Noam. *On Language.* New Delhi: Penguin Books India, 2003.

Ervin-Tripp, Susan. *Sociolinguistics.* Berkeley: California University, 1967.

Wordsworth, William and Coleridge, Samuel Taylor. *Lyrical Ballads, with a few other poems.* London: Bristol, 1798.

অভিধান

দত্ত, বিজিতকুমার, সরকার, পবিত্র ও অন্যান্য (সম্পা.)। *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান* । কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০।

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলক)। *সংসদ বাংলা অভিধান* । কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১১।

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

বসু রায়, শেখর (সম্পা.)। *বৈদগ্ধ্য* । কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৯৯।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.)। *বিভাব* । কলকাতা: বিভাব, ১৯৯৮।

মণ্ডল, জগদীন্দ্র ও চক্রবর্তী, সমর (সম্পা.)। *ময়ূখ* । কলকাতা: ময়ূখ, ১৩৬১-১৩৬২ বঙ্গাব্দ।